মহাবিদ্রোহের কাহিনী

উৎসর্গ

সুধীর ও কাঞ্চন বউদিকে

ছায়া পূর্বগামিনী—১, আজিমুল্লাহ্ খাঁ—৫, শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে—১৩, বিদ্রোহের প্রচার বাহিনী—১৯, চাঁপাটি আর পদ্ম—২৩, মীরাটের বিদ্রোহ—২৭, আজাদ দিল্লীতে ঈদ উৎসব—৩০, এলাহাবাদের বিদ্রোহ—৩৩, বিদ্রোহী মৌলবী—৩৯, বদলা চাই—৫৪, পতিতা আজিজন—৬০, সভ্যতার অবদান—৬৫, নেটিভদের শিক্ষা দেওয়া দরকার—৭৭, পাটনার বিদ্রোহ—৮১, একটি বদমাইসের কাহিনী—৮৭, কুমার সিং—৯১, বিদ্রোহী রোহিলা—৯৮, যে নদী মরু পথে হারালো ধারা—১০৪, উজনালার অন্ধকুপ হত্যা—১১০, একটি গুপ্তচরের কাহিনী—১১৬, নাম না জানা বিদেশী বন্ধু—১২৮, ঝাঁসীর রানী—১৩২, উজীর আলী নকী খাঁ—১৪২, সাবাস চট্টগ্রাম—১৪৯, ঢাকায় কালা-ধলার লড়াই—১৫৪, তাঁতীয়া টোপী—১৬৩, অযোধ্যার বেগম—১৬৯, নাজিম মহম্মদ হাসান—১৫২, যবনিকা পতন—১৭৯।

www.pathagar.com

ভূমিকা

ছেলে বেলায় স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে প্রথম পড়ি 'সিপাহী বিদ্রোহের' কথা। শুয়োর ও গরুর চর্বি মাখানো টোটার প্রশ্ন নিয়ে ধর্মান্ধ সিপাইদের হিংস্র, নিষ্ঠুর রক্তারক্তির এক বিভীষিকাময় কাহিনী। সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে শেখাতে চেয়েছিল, যতটুকু শেখাতে চেয়েছিল, সেই ভাবেই এবং তত-টুকুই শিখেছিলাম, তার বেশী নয়।

আজ বড় হয়েছি। এ শুধু ব্যক্তির কথা নয়, জাতির ক্ষেত্রেও তাই। জাতি আজ স্বাধীন। মুক্ত জাতির মুক্ত বুদ্ধি নিয়েই আজ আমাদের অতীত শিক্ষা এবং ইতিহাসকে বিচার করতে হবে। সেদিন যা আমাদের শেখানো হয়েছিল, তাই কি সত্যি? ১৮৫৭ কি শুধু সিপাইদের একটি বিশেষ রকমের টোটার বিরুদ্ধে অসন্তোষের প্রকাশ? তার উপলক্ষ্য নিয়ে কি অসন্তুষ্ট সামন্ত নৃপতিগণই তাঁদের হৃতশক্তির পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন? টোটার সংঘর্ষে যে শিখার সৃষ্টি, সে কি শুধু সিপাইদের টোটা আর সামন্ত নৃপতিদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল?

আজ নয়, সতর্ক সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ১৮৫৭ শুধু সিপাইদের বিক্ষোভ নয়, ১৮৫৭ বন্দী উপমহাদেশের মুক্তি সাধনার প্রথম মহা আলোড়ন। পাছে এর তাৎপর্য ভারতের আপামর জনসাধা-রণের মুক্তি সাধনার অপরাজেয় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তাই বৃটিশ শাসকবর্গ সচেতন ভাবে ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের ইতিহাসকে বিকৃত করে সিপাইদের অন্ধ বিক্ষোভে এনে দাঁড় করাল।

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে ভারতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা, আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে সেখানকার মানুষের কাছে বিষয়বস্তুটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দিক দিয়ে আমাদের পাকিস্তানের চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক-গণ জাতির সম্মুখে উল্লেখযোগ্য কিছুই উপস্থিত করেন নি।

www.pathagar.com

বন্ধুবর সত্যেন সেন আমাদের এই অভাবকে পূরণ করবার পথে প্রথম পদক্ষেপ করলেন। বই হিসাবে 'মহাবিদ্রোহের কাহিনীর' গুণাগুণের প্রশ্ন ছাড়াও প্রধানতঃ এই দিক দিয়েই আমি তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিশ্রমে তিনি কার্পণ্য করেন নি। ঐকান্তিকতায় তিনি একনিষ্ঠ। একথা সত্য, ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি এই বই তৈরী করেন নি। মহাবিদ্রোহের দিন ক্ষণ, ধারাপঞ্জি এতে নেই। এ বই ইতিহাস নয়, কিন্তু নিজের জ্ঞাতসারে কোথাও তিনি ইতিহাসকে বিকৃত করতে যান নি। মহাবিদ্রোহের মধ্যে যে উজ্জল জীবন ছিল, তাকেই তিনি ইতিহাস থেকে অশেষ পরিশ্রমে উদ্ধার করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাণ্ডুলিপিতে যখন 'বিদ্রোহী মৌলবী,' 'আজিমুল্লাহ খাঁ,' 'পতিতা আজিজন,' 'ঝাঁসীর রাণী,' 'এলাহাবাদের বিদ্রোহ,' 'একটি গুপ্তচরের কাহিনী', 'বিদ্রোহী রোহিলা,' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি পড়ি তখন বিস্মৃতপ্রায় ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আসমুদ্র হিমাচলের ব্যাপকতা, তার সর্বশ্রেণী সমন্বয় গণচরিত্র, তার খ্যাত অখ্যাত নায়ক নায়িকাদের আত্মত্যাগ, তার সচেতন হিন্দু মুসলিম ঐক্যজোট এবং সর্বব্যাপী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলমুক্তির এই অক্ষয় স্মারক আমাকে বিস্মিত করে দেয়। আমাদের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে আমি মনে মনে গর্ববোধ না করে পারি না।

বস্তুতঃ ১৮৫৭ কে নতুন করে সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তাকে বিস্মৃতি ও বিকৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করবার। বন্ধুবর সত্যেন সেনের এই প্রচেষ্টা আমাদের দেশের দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ে প্রেরণা যোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ঢাকা
ডিসেম্বর, ১৯৫৭।

সরদার ফজলুল করিম

www.pathagar.com

ছায়া পূর্বগামিনী

১৭৬৪ সাল। পলাশী যুদ্ধের মাত্র সাত বছর পরে।

১৮৫৭ সালে সিপাইদের যে বিদ্রোহ তামাম হিন্দুস্তানকে উথল করে তুলেছিল যার প্রচণ্ড আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল বৃটিশের জয়স্তম্ভ তারই পূর্বগামিনী ছায়া দেখতে পাই ১৭৬৪ সালে, পলাশী যুদ্ধের মাত্র সাত বছর পরে। কিন্তু এ ইতিহাস আমরা জানিনা!

একজন সাধারণ গোরা সিপাই মাসিক বেতন পায় চল্লিশ টাকা আর একজন দেশী সিপাই পায় মাত্র ছয় টাকা। এই রেওয়াজ চলে আসছে কত দিন ধরে, কেউতো এই নিয়ে কোন দিন কোন কথা বলে নি। এই অব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন থেকে হাওয়াটা কেমন যেন বদলে গেছে। বেঙ্গল আর্মি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। একটা বেয়াড়া মনোভাব, একটা অসহিষ্ণু 'কেন?' বারে বারেই ঠেলে ঠেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে!

কেন, এই তফাৎ কিসের জন্য, কেন এই অবিচার? আমরা কি ওদের চেয়ে কম কাজ করি? পেটের দায়ে জীবন বিক্রি করে দিয়েছি, যখন তখন মরি, দলে দলে মরি—আমরা কি ওদের চেয়ে কম করে মরি? তবে এই অবিচার কিসের জন্য?

সিপাইদের মধ্যে প্রধান যারা, বিচক্ষণ যারা, এসব কথা শুনতে তারা ভয় পায়, বলে, কি যে বলে এসব চ্যাংড়ার দল, আছে বই কি তফাৎ, আছেই তো! আমরা কালো ওরা গোরা আমরা গোলাম ওরা মনিবের জাত। আরশোলা আর পাখী কি কখনো সমান হতে পারে!

www.pathagar.com

ওরা এ কথায় কান পাততে চায় না। ক্ষেপে উঠে বলে, মানব না এই অবিচার। সমান কাজ সমান বেতন এটাই আমাদের দাবী। আমরা তো অন্যায় কিছু চাইছি না। আমাদের এ হক দাবী আদায় না করে আমরা ছাড়ব না।

—বুঝলাম, তোদের মরণ দশায় পেয়েছে, না মরে তোরা ছাড়বিনা। মরবি তো, সেই সঙ্গে আমাদের শুদ্ধ মারবি।

ওরা বলে, মরণ তো একদিন আছেই অত ভয় কিসের?

যে কথা ভাবা যায় না, শেষে কিনা তাই ঘটল। উত্তেজিত সিপাইরা তাদের অফিসারদের ঘেরাও করে তাদের দাবী উপস্থিত করল।

—সমান কাজ, সমান বেতন চাই! গোরা সিপাইরা যদি মাসে চল্লিশ টাকা করে পেতে পারে, আমরাই বা পাব না কেন?

স্পর্ধা দেখে অফিসার সাহেবেরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এদের হয়েছে কি? চোখ তুলে যারা মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারত না তাদের এত ধৃষ্টতা!

মনের রাগ মনেই চেপে রেখে একজন অফিসার মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, "এ হলো গিয়ে আইনের ব্যবস্থা। আমরা কি করতে পারি বল, আমরা তো আর আইন ভাঙ্গতে পারি না। এমন বে আইনী দাবী কেমন করে তুলছ তোমরা?"

"তোমাদের এ আইন আমরা বুঝি না সাহেব। এ মাইনে নিয়ে আমরা কাজ করব না—আমরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।"

মুখের হাসি দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জন করে উঠলেন সাহেব।

"বটে, কাজ করবে না! তোমাদের খুশী কিনা! এটা মিলিটারী চাকুরী, চুক্তি করে কাজে ভর্তি হয়েছ। ইচ্ছা করলেই চাকুরী ছাড়া যায় না।"

সাহেবের ধমকে ওরা কিন্তু ভয় পেল না। ওরাও উত্তেজিত, এক সঙ্গে সবাই মিলে কলরব করে উঠল, "আমরা ওসব চুক্তি টুক্তি বুঝি না, যেখানে কোন বিচার নেই, সেখানে অমরা কাজ করতে পারব না। চল ভাই সব, চল!"

www.pathagar.com

"বটে, মিউটিনি! সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে! আচ্ছা, দেখ এবার মজাটা।"

বেছে বেছে চব্বিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হোল। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে এরা সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ করবার ষড়যন্ত্র করছিল।

কোর্ট মার্শাল।

ছাপরার মিলিটারী কোর্টে বিচার শুরু হয়ে গেল। বিচার তো নয় প্রহসন।

সঙ্গে সঙ্গেই রায় বেরিয়ে গেল, এই চব্বিশ জন সিপাইকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ময়দানে সমস্ত সিপাইরা এসে জড় হয়েছে। না এসে উপায় নেই, আসতেই হবে, চোখ মেলে দেখতেই হবে এই ভয়ানক দৃশ্য। এটাই নিয়ম।

চব্বিশ জন বীর বন্দীকে নিয়ে আসা হোল। ওরা আসছে, আর ওদের চব্বিশ জনের পায়ের শিকল ঝন্ ঝন্ করে বাজছে।

শত শত নিঃশব্দ সিপাইর বুকের মধ্যে কি এক আলোড়ন জেগেছিল সেদিন, তারাই শুধু জানে! আর সেই চব্বিশ জন বন্দী? সংসার থেকে বিদায় নেবার শেষ মুহূর্তে কোন কথা তাদের মনে সব চেয়ে বেশী ভেসে উঠেছিল? তাদের বাপ, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের কথা? না কি তারা দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলছিল—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চাই। আমাদের সিপাই ভাইরা, আমাদের দেশের মানুষ, তারা কি কোন দিন এর প্রতিশোধ নেবে না?

চারটি কামান সাজানো ছিল।

মেজর জেনারেল মুনরো এগিয়ে এসে অর্ডার দিলেন। প্রথমে চারজন বন্দীকে নিয়ে এসে প্রত্যেককে এক একটি কামানের মুখে বেঁধে দেওয়া হোল। চারটা কামান এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল।

তারপর আরও চারজন। তারপর আরও। এইভাবে চব্বিশ জন বন্দী শহীদ হলেন।

নিস্তব্ধ জনতা নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

www.pathagar.com

সেদিন থেকে ৯৩ বছর পরে সিপাইদের নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণের এই মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হোল। যে কঠিন রক্তাক্ত প্রতিশোধ সেদিন নেওয়া হয়েছিল, ইতিহাসের পাতা থেকে তার দাগ কোনদিন মুছবে না।

১৭৬৪ সালের বীর শহীদেরা, তোমরা তৃপ্ত হয়েছ তো?

www.pathagar.com

আজিমুল্লাহ খাঁ

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই আজিমুল্লাহ্ খাঁর নাম জানেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু আছে, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই শিক্ষিতই বলুন আর অশিক্ষিতই বলুন, ক'জনেই বা শুনেছেন আজিমুল্লাহ্ খাঁর নাম! বিদ্রোহকে প্রথম থেকে সচেতনভাবে সংগঠিত করে তুলবার ব্যাপারে যে কয়জন লোক অগ্রগামী ছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। তখনকার দিনে আমাদের দেশে প্রতিভা, কূটবুদ্ধি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টির দিক থেকে তাঁর সাথে তুলনা করবার মত দ্বিতীয় একজন লোক আমাদের চোখে পড়ে না।

কূটনৈতিক বৃটিশ তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী চিনতে ভুল করেনি। তাই তাদের ক্রোধ, ঘৃণা ও কটূক্তি তীব্রভাবে বর্ষিত হয়েছে তাঁরই উপরে। বৃটিশ ঐতিহাসিকদের লেখায় তাই আমরা দেখি, আজিমুল্লাহ্ খাঁ ধূর্ত, নৃশংস ও রক্তপিপাসু। কিন্তু এই কি তার পরিচয়?

রূপকথার কাহিনীর মতই বিস্ময়কর আজিমুল্লাহ খাঁর জীবন।

নিতান্ত গরীবের ঘরে জন্ম। দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটবে এমন সঙ্গতি নেই। বয়স তখন খুবই কম, শিশু বললেই চলে। আর সবাই যে বয়সে খেলাধূলো নিয়ে মেতে থাকে, কঠিন জীবন সংগ্রামের জন্য তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে এক ইংরাজ সাহেবের বাড়ীতে বয়ের কাজে ঢুকতে হোল।

ছেলেবেলা থেকে সাহেববাড়ীতে বয় ও খানসামার কাজ করবার ফলে বহু সাহেবের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছে। এই প্রিয়দর্শন তরুণ খানসামাটি অতি সহজেই সকলের মন জয় করে নিতে পারত। আজিমুল্লাহ্ এই সুযোগটিকে কাজে লাগাতে ছাড়লেন না। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ইংরাজী ও ফরাসী এই দুটো ভাষাতেই দিব্যি কথা বলতে শিখে গেলেন। শুধু কি কথা বলা, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার

www.pathagar.com

ফলে তিনি সাহেবী সমাজের চালচলন, আদব কায়দা বেশ ভালভাবেই রপ্ত করে ফেললেন। পরবর্তী জীবনে এটা তাঁর খুবই কাজে লেগেছে।

একদিন যাঁকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করতে হবে খানসামা-বাবুর্চির কাজের মধ্যে তাঁকে আটকা থাকলে চলে না। বাইরের জগতের আলো বাতাসের সংস্পর্শ পাবার জন্য মন তাঁর উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু পড়াশোনা না করতে পারলে কি করেই বা তা সম্ভব হবে!

যে করেই হোক, পড়াশোনা করা চাই।

বাবুর্চিখানা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আজিমুল্লাহ্। কানপুরের একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলেন। সেখানে ওস্তাদ গঙ্গাদীনের কাছে তাঁর যথারীতি ইংরাজী শিক্ষা শুরু হোল। ওস্তাদজীর হাতে এমন ছাত্র আর কোনদিন আসেনি। ছাত্র হিসাবে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিলেন তিনি। ফলে সে স্কুলেই তাঁকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে নেওয়া হোল। কৈশোরের খানসামা তরুণ শিক্ষক আজিমুল্লাহ্ খাঁ শিক্ষকতার কাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। এর পর আজিমুল্লাহ্ খাঁ যখন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন তখন শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সমস্ত কানপুরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাঁর এ খ্যাতি নানা সাহেবের কানে গিয়ে পৌঁছল। বহু লোকের কাছে তাঁর কথা শুনে তিনি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এক শুভলগ্নে দুজনের পরিচয় ঘটল। এটি নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় দিন। পরিচয় শেষে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হোল।

নানা সাহেবের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে নানা সাহেব কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতেন না। দুজনের ভিতরকার এ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ভবিষ্যতে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

এ সময় নানাসাহেবের জীবনে এক গুরুতর সংকট দেখা দিল। পেশোয়া বাজীরাও কোম্পানীর নিকট থেকে পেনসন ভোগ করে আসছিলেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর কোম্পানী এ পেনসন দেওয়া বন্ধ

www.pathagar.com

করে দিলেন। দত্তক পুত্র হিসাবে নানা সাহেবের অধিকার তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন। পেনসনের দাবী করে নানা সাহেব কোম্পানীর কাছে দরখাস্ত পাঠালেন। কিন্তু সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়ে গেল।

নানা সাহেব তাতেও দমলেন না। খাশ বিলাতে এ মামলা নিয়ে লড়বার জন্য নিজের প্রতিনিধি পাঠাবেন বলে স্থির করলেন। এ বিষয়ে আজিমুল্লাহ্ খাঁর চেয়ে যোগ্যতর লোক কেই বা আছে!

তাই ঠিক হোল। আজিমুল্লাহ্ই যাবেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এ মামলাটার একটা হেস্ত নেস্ত করবার জন্য নানা সাহেবের প্রতিনিধি আজিমুল্লাহ্ খাঁ বিলাত যাত্রা করলেন।

তাঁর সঙ্গে সেদিন ক'জন ছিলেন বা কে কে ছিলেন, সে খবর আমরা জানিনা। কিন্তু একজনের নাম জানতে পারা গেছে। তিনি হচ্ছেন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ আলী খাঁ। জনসাধারণের কাছে তাঁর নাম সুপরিচিত না হলেও, বিদ্রোহের ব্যাপারে তাঁর অবদান যথেষ্ট ছিল, সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁর কাহিনী অন্যত্র বলা হয়েছে।

লণ্ডনে এসে পা দেবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। মণিমুক্তায় সজ্জিত ভারতীয় 'রাজা'কে দেখবার জন্য লণ্ডনের পার্কে ও ব্রাইটনের সমুদ্র উপকূলে দস্তুরমত ভীড় জমে যেত। আজিমুল্লাহ্ ইংরাজ সমাজের চালচলন, আদব কায়দা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁর সুশ্রী চেহারা, সুমিষ্ট কণ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক আলাপের গুণে লণ্ডনসমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠতে তাঁর বেশীদিন লাগল না। একথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, ঐশ্বর্যের গন্ধে আকৃষ্ট অসংখ্য শ্বেত মধুমক্ষিকার দল সেদিন তাঁর চারিদিক ঘিরে গুঞ্জরণ করে চলছিল।

নিজের কাজ হাসিল করবার জন্য তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। পানির মত অজস্র টাকা তিনি ঢেলে চলেছিলেন। সেখানকার রেওয়াজ অনুযায়ী তিনি বড় বড় সামাজিক মজলিস জমাতেন, শহরের সেরা সেরা লোকদের দাওয়াৎ দিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁর আশা ছিল এ সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের হোমরা চোমরাদের

www.pathagar.com

উপর বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন এবং তারই মধ্য দিয়ে মামলাটারও সুরাহা করবার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আজিমুল্লাহ্‌র জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। বিশেষ করে সেখানকার মহিলা সমাজে তিনি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর রূপ ও ঐশ্বর্যের আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়বার জন্য অনেক পতঙ্গই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ বা জ্বলন্ত পাখায় ছটফট করে মরছিল। তিনি হিন্দুস্তানে ফিরে আসবার পরেও অনেক ইংরাজ তরুণী তাঁর কাছে প্রেমপত্র দিতেন। জেনারেল হ্যাভলক যখন নানা সাহেবের মূল আস্তানা বিঠুর অধিকার করে আজিমুল্লাহ্‌র বাসগৃহ ভস্মসাৎ করে দিয়েছিলেন, সে সময় তিনি 'ডার্লিং আজিমুল্লাহ্‌র' কাছে লেখা কয়েকটি ইংরাজ তরুণীর প্রেমপত্রের সন্ধান পান। বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা যে আজিমুল্লাহ্‌র সম্পর্কে এত বেশী খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, তার কিছুটা কারণ হয়তো এর মধ্যেও নিহিত ছিল।

কিন্তু ইংরাজ তরুণীদের মন তাঁর দিকে যতই ঝুঁকে পড়ুক না কেন, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কঠিন মনোভাবের এক চুল পরিবর্তন করতে পারেন নি। অজস্র অর্থব্যয়, যুক্তিতর্ক, প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকৌশল সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে গেল। এ সম্পর্কে কোম্পানী যে কতদূর পর্যন্ত একরোখা ও অনমনীয়, আজিমুল্লাহ্‌ আগে তা কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁর পক্ষের যুক্তি যতই সারবান ও প্রখর হোক না কেন, দেশ বিদেশের জনমত যাই বলুক না কেন, ভারতের কোন দেশীয় রাজা বা তার প্রতিনিধির পক্ষে লর্ড ডালহাউসীর এ রায়কে বাতিল করাবার চেষ্টা নেহাত পণ্ডশ্রম মাত্র। এ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করবার সামান্য সম্ভাবনাটুকু মাত্র ছিল না।

সকল যুক্তির বড় যুক্তি হচ্ছে বাহুবল, নগদ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করে আজিমুল্লাহ খাঁ এ সার সত্যটিকে শিখতে পেরেছিলেন। এ শিক্ষা পরে তাঁর কাজে লেগেছিল।

কোম্পানীর বড় কর্তারা কিছুদিন পর্যন্ত একথা সেকথা বলে শেষ পর্যন্ত তাদের বাঁধা গৎ-এ এর সাফ জবাব জানিয়ে দিলেন ঃ

www.pathagar.com

"বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্রের পৈত্রিক পেনসনের উপর কোন দাবী থাকতে পারে না, গভর্ণর জেনারেলের এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা ষোল আনা একমত।"

কোম্পানীর কাছ থেকে এ কঠিন ঘা খেয়ে আজিমুল্লাহ্ নতুন করে চেতনা লাভ করলেন। যে জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনই ধারণা ছিলনা সে সম্পর্কে দৃষ্টি খুলে গেল। কানপুরে বসে ইংরাজী শিখেছিলেন, আর বিলাতে এসে ইংরাজকে বুঝতে শিখলেন। বুঝতে পারলেন, এ পথে কার্য সিদ্ধ হবে না। এ ছাড়া আর কোন পথ কি আছে?

সে একই সময় আর একজন ভারতীয় লণ্ডনে বসে ঠিক এ কথাই ভাবছিলেন্ আর কোন পথ কি আছে? তাঁর নাম রঙ্গ বাপুজী। আজিমুল্লাহ্র মতই তিনিও এসেছিলেন সাতারার রাজার পক্ষ থেকে কোম্পানীর কাছে দরবার করবার জন্য। সেখানেও এ একই সমস্যা অনেক দরখাস্ত, আবেদন, নিবেদন, তদ্বির কোন কিছুতেই কিছু হোল না। আজিমুল্লাহ্র মতই তিনিও কোম্পানীর পক্ষ থেকে সাফ জবাব পেয়ে গেলেন।

ব্যর্থতা থেকে হতাশা, হতাশা থেকে প্রতিহিংসা! দুজনে একই তরণীর যাত্রী। পেশোয়ার প্রতিনিধি আর সাতারার প্রতিনিধির মধ্যে ঘন ঘন আলাপ আলোচনা আর বদ্ধ দ্বারে গোপন পরামর্শ চলত। সেদিন বিঠুরের খান সাহেব আর সাতারার বাপুজীর মধ্যে কি নিয়ে গোপন পরামর্শ চলেছিল, ইতিহাস সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারে না। কে জানে, সেদিন আবেদন নিবেদনের বিকল্প হিসাবে তাঁদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রাথমিক আলোচনা চলেছিল কিনা। লোকে তো তাই বলে।

রঙ্গ বাপুজী লণ্ডন থেকে সোজা সাতারা ফিরে গেলেন। কিন্তু আজিমুল্লাহ্র পথ আলাদা। ইউরোপীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল লণ্ডন, এখানে এসে বৃহত্তর পৃথিবীর হাল চাল কিছুটা তাঁর নজরে এল। নতুন চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠল তাঁর মন। বৃটিশ রাজত্বের ছত্রছায়ার নীচে ভারতবর্ষের জমিনে বসে এ অভিজ্ঞতা লাভের কোনই সুযোগ ছিল না।

www.pathagar.com

বাস্তব অবাস্তব কত রকমের কত চিন্তা, কত কল্পনা তাঁর মনের মধ্যে আসা যাওয়া করতে লাগল। ব্যর্থ মনে, শুধু একরাশ হতাশা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে যেতে রাজী নন।

নিজের চোখে একবার দেখে নেব নতুন দুনিয়ার রূপটা। দেখে যাব ইংরাজের শক্তির উৎসই বা কোথায়, দুর্বলতাই বা কোথায়। ওদের দুর্গের কোথায় কোথায় ভাঙ্গন ধরেছে, খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। ইংরাজের মিত্রই বা কারা, আর শত্রুই বা কারা? শুধু পুঁথিপত্রের সাহায্যে নয়, নিজের হাতে বাজিয়ে দেখে নিতে হবে।

দেশে ফিরবার আগে ইউরোপ ভ্রমণের পিছনে এ রকমের ভাবনাই বোধ হয় কাজ করেছিল আজিমুল্লাহ্‌র মনে।

প্রথমে গেলেন তুরস্কের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল্‌সে। তুরস্কের সুলতান তখন মুসলিম জগতের খলিফা। সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানেরা তুরস্কের প্রতি ধর্মীয় আনুগত্য বহন করে। কনষ্ট্যান্টিনোপল্‌সে গিয়ে আজিমুল্লাহ্‌ জানতে পারলেন যে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। তুরস্কের মিত্রপক্ষ ইংরাজ সেবাস্তোপলের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে রাশিয়ার কাছে দারুণ মার খেয়েছে। দুপক্ষের বলাবল নিজের চোখে পরখ করে দেখবার জন্য তিনি কিছুদিন রাশিয়ায় গিয়ে রইলেন।

রাশিয়া কি এশিয়ার ক্ষেত্রে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে! যদি তাই হয়, তা হলে বৃটিশের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে কোনরূপ আক্রমণমূলক বা আত্মরক্ষামূলক সন্ধি করা যায় কিনা? কোন কোন বৃটিশ ঐতিহাসিক বলেছেন যে এ মতলব নিয়েই আজিমুল্লাহ্‌ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। এ দেশের লোকদেরও সে রকম ধারণাই ছিল। সিপাইদের বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে আরম্ভ করল যে নানা সাহেব রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। রাশিয়ার সৈন্যরা ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরী হয়েই আছে।

আজিমুল্লাহ্‌ যখন রাশিয়ায় ছিলেন, তখন লণ্ডন টাইমসের সংবাদদাতা মিঃ রাসেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তখন রাশিয়ানদের সঙ্গে ইংরাজদের লড়াই চলছিল। ১৮ই জুন তারিখে ইংরাজ ও

www.pathagar.com

ফরাসীদের মিলিত বাহিনী রাশিয়ান বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এ খবর পেয়ে আজিমুল্লাহ্ ইংরাজদের শিবিরে এসে মিঃ রাসেলের সঙ্গে দেখা করেন।

মিঃ রাসেল বেরিয়ে আসতেই আজিমুল্লাহ্ বললেন,

"সিবাস্তোপল শহরে ইংরাজ ও ফরাসীদের হার মানতে হয়েছে। আমি সে বিখ্যাত শহরটিকে একবার দেখতে চাই। আর আমি দেখতে চাই রুস্তমের মত বীর সে রাশিয়ানদের, যারা ইংরাজ ও ফরাসীদের হটিয়ে দিয়েছে।"

আজিমুল্লাহ্‌র এ আগ্রহ মিটাবার জন্য মিঃ রাসেল তাঁকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। রাশিয়ানদের কামানগুলি অবিশ্রান্ত গর্জন করে চলেছে, আজিমুল্লাহ্ কৌতূহলের সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ একটা কামানের গোলা প্রচণ্ড শব্দ করে তাঁর কাছে এসে ফেটে পড়ল। কিন্তু তিনি একটুও নড়লেন না, যেমন ছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলেন।

সেদিন আজিমুল্লাহ্ মিঃ রাসেলের তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করেন। তাঁবু থেকে বাড়ী ফিরে যাবার সময় তিনি মিঃ রাসেলকে বললেন, "দেখুন মিঃ রাসেল, রাশিয়ানদের এ সুরক্ষিত ঘাঁটিটিকে আপনারা কখনও দখল করতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে খুবই সন্দেহ আছে।"

পরদিন আজিমুল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ খাঁ সিবাস্তোপল থেকে আবার কনষ্ট্যান্টিনোপল্‌সে ফিরে এলেন। এখানে কয়েকজন রুশ এজেন্টের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। তাঁরা তাঁদের ভরসা দিয়েছিলেন যে, হিন্দুস্তানে ইংরাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে পারলে রুশ সরকার বিদ্রোহীদের মুক্ত হস্তে সাহায্য দেবেন।

যে কল্পনা নিয়ে আজিমুল্লাহ্ লণ্ডন ছেড়ে ইউরোপ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন, এবার যেন তা একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। তাঁর সঙ্গী মহম্মদ আলী খাঁ বলেছেন ঃ রুশ এজেন্টদের কাছে সামরিক সাহায্য পাবার আশ্বাস পেয়েই আজিমুল্লাহ্ আর আমি ভারতব্যাপী বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে এই সময়টা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এ হচ্ছে ১৮৫৪ সালের কথা।

তুরস্ক ও রাশিয়া ত্যাগ করে আজিমুল্লাহ্ বিপ্লবের ইন্ধন সংগ্রহ করবার জন্য আর কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছিলেন, সে কথা জানবার কোন উপায় আজ নেই। তাঁর এই ভ্রমণের ফলাফল কি হয়েছিল, তাও আমরা জানি না। শোনা যায়, চন্দননগরের ফরাসীদের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কিনা এ সম্পর্কে ফরাসী সরকারের সঙ্গেও না কি কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। মিসরের সঙ্গেও নাকি এ বিষয়ে কিছুটা আলাপ হয়েছিল। সম্ভবতঃ এ কথার পিছনে কিছুটা সত্যতা আছে।

ইউরোপ পর্যটন শেষ করে আজিমুল্লাহ্ দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু যে আজিমুল্লাহ্ নানা সাহেবের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর মামলার তদবির করতে বিলাত গিয়েছিলেন এ আজিমুল্লাহ্ সে আজিমুল্লাহ্ নন। ইংরাজের মন জয় করে কাজ বাগিয়ে আনতে গিয়েছিলেন যিনি তিনি ফিরলেন বৃটিশ রাজত্ব ধ্বংসের ব্রতে ব্রতী হয়ে।

সুদূর কনষ্ট্যান্টিনোপলসে বসে একদিন যে অভ্যুত্থানের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তাকে আজ কাজে রূপ দিতে হবে। একি সহজ কাজ? ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি জনসাধারণ যে আহ্বানে আকুল ও উদ্বেল হয়ে উঠবে কোথায় সে আদর্শ? কোথায় সে দেশব্যাপী সংগঠন? কোথায় সে নেতৃত্ব? কিন্তু জাতি অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, চলার মধ্য দিয়ে, ভাঙ্গাগড়া, আঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন চেতনা, নতুন প্রকৃতি, নতুন বেগ সংগ্রহ করে সম্মুখে এগিয়ে চলতে থাকে।

এ পথ সহজ নয়। অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পথ কেটে চলতে হয়। বৃটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের জমিন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

আজিমুল্লাহ্ এবার কাজে হাত লাগালেন।

www.pathagar.com

শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ। পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ঘনকৃষ্ণ আকাশে প্রথম বিদ্যুদ্দীপ্তি! বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে প্রথম শহীদের আত্মদান! মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে এ তারিখ চিরস্মরণীয়। বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডেকে স্মরণ করে মাথা নত কর।

রবিবারের অপরাহ্ন। ব্যারাকপুরের প্যারেড ময়দানে এমন অসময়ে আজ কিসের ভীড়! ৩৪নং ইনফ্যানট্রির সিপাইরা আজ দলে দলে জটলা পাকাচ্ছে। এখানে ওখানে সেখানে একটা ফিসফিস চাপা গুঞ্জনের শব্দ উঠছে। সিপাইদের মধ্যে কেউ কেউ ডিউটির পোষাক পরে এসেছে, কেউ বা খালি গায়ে, কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ বা নিরস্ত্র। লোকের ভীড় ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। সকলের দৃষ্টি একই দিকে ঝুঁকে পড়েছে। উত্তেজনায় সবাই যেন টগবগ করে ফুটছে।

লাইন থেকে পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে মঙ্গল পাণ্ডে বন্দুক কাঁধে নিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে। ময়দানে যারা এসে ভীড় জমিয়েছে, সবাই চেয়ে আছে তারই দিকে, তারই কথা নিয়ে সবাই কানাকানি করছে।

ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ, ধীর স্থির প্রকৃতি, নিজের স্বভাবের গুণে সকলের কাছে জনপ্রিয় মঙ্গল পাণ্ডেকে না চেনে কে! সেই প্রতিদিনের অতিপরিচিত মঙ্গল পাণ্ডে আজ কি এক নতুন মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে, তাকে চেনা যায়, আবার যেন চেনাও যায় না। কে জানে কোন দেবতা তার উপর এসে ভর করেছে! কানে কানে সবাই সে কথাই বলাবলি করছিল।

উদ্ধত চিবুক আকাশের দিকে তুলে গুলীভরা বন্দুক কাঁধে নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে একবার সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার দিয়ে উঠল: "বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো ভাই সব! ফিরিঙ্গীর পায়ের তলায় আর কতদিন পড়ে থাকবে! ওরা

www.pathagar.com

আমাদের সোনার দেশ লুটেপুটে খাচ্ছে, আর আমরা মরছি না খেয়ে। ওরা আমাদের ধর্মের ওপর হাত দিয়েছে, আমাদের জাতিভ্রষ্ট করেছে। ভাই সব, ফিরিঙ্গীদের মারো, একটা একটা করে সব ব্যাটাকে মারো; ফিরিঙ্গীদের খতম করে দেশকে স্বাধীন কর।

"হক কথা বলেছে, ন্যায্য কথা বলেছে; পাণ্ডে তো মিছে বলেনি," কয়েকজন মন্তব্য করে। মঙ্গল পাণ্ডের এই ডাক, কি অদ্ভুত তার শক্তি! সিপাইদের মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরে যায়, উত্তেজনায় স্নায়ুগুলি টনটন করে ওঠে! সামান্য ক'টাকা মাইনের সিপাই, পোষাক পরে পোষাক খোলে, নিয়মিত ময়দানে গিয়ে প্যারেড করে, লড়াই লাগলে জান দেয় জান নেয় তাদের মধ্যে তো এ সমস্ত উপসর্গ ছিল না। ওদের আজ হয়েছে কি? কিসের এক অন্ধ আবেগে ওদের প্রাণ দুলে দুলে ওঠে, এতদিনের জমাট কঠিন বরফের স্তূপ অকস্মাৎ উন্মাদিনী নির্ঝরিণীর রূপ ধরে পাহাড়ের পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরতে চায়! কি অদ্ভুত এই উন্মাদনা, কি এর নাম! মূর্খ সিপাই তার কি জানে?

এ কি দেশপ্রেম, আহত ধর্ম-বিশ্বাস, অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, না এ কি?

'বেরিয়ে এসো ভাইসব। দেশ আর ধর্মের এই দুশমনদের খতম কর।'

মঙ্গল পাণ্ডে কি যাদু জানে! কি দুর্নিবার তার এই আহ্বান!

কিন্তু তবু, তবু তারা আসতে পারে না। কোথায় যেন একটা প্রবল বাধা, একটা অদৃশ্য শৃংখল যেন তাদের বেঁধে রেখেছে। অস্থির হয়ে ওঠে প্রাণ, ছটফট করে, তবু তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। এতদিনকার অভ্যস্ত সামরিক শৃংখলাবোধ, প্রভুভক্তি, নিমকের মর্যাদা, অভ্যস্ত জীবনের প্রতি মোহ, আশংকা, আতংক, সব কিছুই রক্তের মধ্যে মিশে আছে—ছাড়তে চাইলেও ছাড়ানো যায় না।

এ দোটানার মধ্যে পড়ে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ রাস্তায় ঘোড়ার খুরের টগবগ শব্দ শোনা গেল। সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকায়। মঙ্গল পাণ্ডের খবর শুনে এ্যাডজুটেণ্ট লেফটেন্যাণ্ট বাগ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছেন। তাঁর

www.pathagar.com

কোমরবন্ধে গুলীভরা পিস্তল, কোমরে ঝুলছে তরোয়াল। বিদ্রোহের এই সূচনাকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে হবে, তাঁর দুই চোখে তারই দৃঢ় কঠিন সংকল্প।

সামরিক হুকুমতের প্রতীক ওই লাল কোটটি। কি আশ্চর্য ওর শক্তি। ওর দিকে তাকালেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখের পাতা নেমে আসতে চায়। লেফটেন্যাণ্ট বাগের লাল কোট ক্রমশঃই আগে আরও আগে এগিয়ে আসছে।

উত্তেজনা আর এক পর্দা উপরে উঠল। সিপাইরা মনে মনে অনুভব করছে এখনই সাংঘাতিক ঘটনা একটা কিছু ঘটে যাবে। বিদ্রোহ মোকাবিলা করছে সামরিক শৃংখলার সঙ্গে, কে জানে কি ঘটবে তার পরিণতি! এক বিচিত্র অভিনয় এখনই অভিনীত হবে। এখনই যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হবে—নির্বাক স্তব্ধ দর্শকগণ অধীর চিত্তে মুহূর্ত গুণছে।

যেদিকে তাকাও সবার মনই অস্থির চঞ্চল উদভ্রান্ত। এর মধ্যে একমাত্র মঙ্গল পাণ্ডে স্থির অবিচলিত। ধীর শান্ত ভাবে কি করে আসন্ন বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, মঙ্গল পাণ্ডে তা জানেন।

মঙ্গল পাণ্ডে একবার হাঁটা বন্ধ করে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। হঠাৎ নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। ঘোড়াটা কদমে কদমে এগিয়ে আসছে। আর সোজা তার দিকে মুখ করে কাঁধে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মঙ্গল পাণ্ডে। ব্রোঞ্জের মূর্তির মত অচল অটল। সায়াহ্নের শেষ রোদটুকু লুটিয়ে পড়ছে তাঁর চোখে মুখে ললাটে।

লেফটেন্যাণ্ট বাগের ঘোড়া সোজা তার গায়ের উপর এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডের বন্দুক গর্জন করে উঠল। ঘোড়াটা একটা পাক খেয়ে উপুর হয়ে পড়ে গেল। গুলীটা ঘোড়ার পায়ে লেগেছে। ঘোড়া আর তার সওয়ার জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে গেল। সে অবস্থাটাতেই মাত্র দশ কদম দূর থেকে লেফটেন্যাণ্ট বাগ তার পিস্তল তাক করলেন। পিস্তলের মুখে একটা লাল শিখা একটু ঝিলিক মেরে উঠল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল পাণ্ডের তরোয়ালের ঘায়ে লেফটেন্যাণ্ট বাগ ধরাশায়ী হলেন।

আবার শোনা গেল দ্রুত পায়ের শব্দ। লেফটেন্যাণ্ট বাগের পিছন

www.pathagar.com

পিছন ছুটে এসেছেন সার্জেন্ট মেজর। পাণ্ডের তৃষ্ণার্ত তরোয়াল আর একবার নেচে উঠল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সার্জেন্ট মেজর লেফটেন্যাণ্ট বাগের পাশেই ধূলিশয্যা নিয়ে চিরতরে চোখ বুজলেন।

একি অদ্ভুত ঘটনা! এমন কথা কেউ কখনও ভাবতে পেরেছেন! উত্তেজিত সিপাইদের চোখে নতুন দীপ্তি খেলা করে গেল। দু দুজন দুর্দান্ত গোরা অফিসার মারা পড়ল কিনা তাদেরই মত একজন কালো সিপাইর হাতে! এও তবে সম্ভব!

বাহাদুর মঙ্গল পাণ্ডে! সিপাইদের মধ্যে উল্লাসধ্বনি উঠল।

ইতিমধ্যে কয়েকজন ইংরাজ অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। কর্ণেল হুইলার আদেশ দিলেন, পাণ্ডেকে গ্রেফতার করো। কোন সিপাই নড়ল না। কারো কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে সোজা জবাব দিলেন, 'পাণ্ডের গায়ে আমরা কেউ হাত দেবনা।'

নির্ভীক পাণ্ডে কাঁধে বন্দুক নিয়ে তেমনি অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। সিপাইদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁরই দিকে।

কর্ণেল সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, অবস্থা বেগতিক। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে এ ধরণের দৃশ্য অবলোকন করা মোটেও প্রীতিপ্রদ নয়, নিরাপদও নয়। তার চেয়ে উপওয়ালাদের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি বুদ্ধিমানের কাজই করলেন।

সংবাদ পেয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিয়ার্সে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এলেন। জেনারেল হিয়ার্সে দেখলেন দুটি লাল কোট ধুলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। বিজয়ী মঙ্গল পাণ্ডে উদ্ধত ভঙ্গিতে বন্দুক কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে। সিপাইদের চোখে মুখে উত্তেজনা।

জেনারেল হিয়ার্সে তৎপরতার সঙ্গে কয়েকজন অফিসার নিয়ে বিদ্রোহীকে ঘেরাও করে ফেললেন।

মঙ্গল পাণ্ডে সম্ভবতঃ মনে মনে আশা করছিলেন সংকটের সময় বন্ধুরা তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ

www.pathagar.com

যখন এল না, যখন দেখলেন শত্রুর হাতে মৃত্যু অবধারিত, তখন তিনি সেই মুহূর্তেই তাঁর শেষ করণীয় স্থির করে ফেললেন।

কেউ লক্ষ্য করতে না করতে বিদ্যুতগতিতে কাজটা শেষ হয়ে গেল। বন্দুকের নলটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিলেন। গুলীবিদ্ধ মঙ্গল পাণ্ডে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই গুলীতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। অনেক চেষ্টা করে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা হোল যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে ফাঁসি দেবার জন্য।

৮ই এপ্রিল তারিখে মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেফতার করতে অস্বীকার করে ঈশ্বরী পাণ্ডে উপরওয়ালার হুকুম অমান্য করেছিলেন এ অপরাধে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়।

বিদ্রোহী মঙ্গল পাণ্ডের এ বীরত্বপূর্ণ কাহিনী সমস্ত ব্যারাকপুরে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা এ অঞ্চলের মানুষের মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। ফাঁসির আগে যখন ঘাতকের জন্য খোঁজ করা হোল, ব্যারাকপুরের কোন লোক এ কাজ করতে রাজী হোল না। তখন কি আর করা! বাধ্য হয়ে কলকাতা থেকে চারজন জল্লাদ আনিয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়েছিল।

মঙ্গল পাণ্ডে নিজের জীবন দান করে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বাধীনতার সৈনিকেরা এ মশালের আলোয় পথ দেখে চলেছেন। ইংরাজরা তাঁর কথা ভুলতে পারেনি। মঙ্গল পাণ্ডের নাম অনুসরণ করে তারা বিদ্রোহীদের নাম দিয়েছিল "পাণ্ডিয়া"।

মঙ্গল পাণ্ডের এ নির্ভীক আত্মোৎসর্গের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা অনেকেই বলেছেন যে মঙ্গল পাণ্ডে ভাঙের নেশায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে এ কাজ করেন। মঙ্গল পাণ্ডের দেশের মানুষ কিন্তু মনে করে মঙ্গল পাণ্ডে নেশায় উন্মত্ত হয়ে এ কাজ করেছিলেন একথা ঠিকই, নেশা না হলে এমন কাজ কেউ করতে পারে না। তবে সে নেশা দেশ প্রেমের নেশা।

ব্যারাকপুরের কোর্টের সমুখ দিয়ে প্যারেড রোড চলে গেছে। এ রাস্তা

www.pathagar.com

ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলো। আধ মাইল দূরে রেল লাইনের পাশেই একটি ঐতিহাসিক অশ্বত্থ গাছ দেখতে পাবে। গাছটি বহু প্রাচীন। ১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিলের সকাল দশটায় মঙ্গল পাণ্ডেকে এ গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়। গত একশো বছর ধরে একটি পবিত্র জীবনের নিঃস্বার্থ আত্মাহুতির কালজয়ী স্মৃতিকে বহন করে গাছটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

বিদ্রোহের প্রচার বাহিনী

একথা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামে প্রদেশ থেকে প্রদেশে সমস্ত ভারতময়। হিন্দু মুসলমান সকলের মধ্যেই একথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট বড় সবাই একথা জানত। হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র এ আলোচনা চলত: পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পরে, ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে, দেশ আবার দেশের মানুষদের হাতে ফিরে আসবে।

কে প্রথম একথা প্রচার করেছিল, কেউ তা' বলতে পারেনা। কোন ফকীর, কোন সন্ন্যাসী, নাকি কোন বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা? নাকি সমগ্র দেশের মানুষের প্রাণের উদগ্র কামনা এ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে রক্ত রঙিন গোলাপের মতই ফুটে উঠেছিল?

যেই প্রচার করুক, ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, মানুষের মন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তাই এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যুতের মতই খেলা করে গেল। এ চিন্তা মানুষের প্রাণে এক অদ্ভুত আশা ও প্রেরণার সৃষ্টি করে তুলল। তাই দেখতে পাই ১৮৫৭ সালের সূচনা থেকেই ভারতের মানুষ যেন রুদ্ধ আবেগে দুলে দুলে উঠছে। একটা বিরাট কিছু আসছে, দুর থেকে তার অস্ফুট পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

একটা বিরাট প্রচার সংগঠন কাজ করে চলেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এ সংগঠনের কতটুকু কেন্দ্রীয় কতটুকুই বা আঞ্চলিক এ হিসাব কেউ দিতে পারবে না। তবে এ সমস্ত প্রচারকেরা কি অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এ প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন, ভাবলে অবাক হতে হয়।

ফকীর সন্ন্যাসী দরবেশ বা জ্যোতিষী সেজে এ সমস্ত প্রচারকেরা তাঁবুতে তাঁবুতে, কেল্লায় কেল্লায় ঘুরে যেখানে যেটুকু সুযোগ পেতেন

www.pathagar.com

তারই মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন। এঁরা পোষাকের আড়ালে অস্ত্র নিয়ে চলতেন বিপদে পড়লে গোপন ঝোলা থেকে শানিত তরোয়াল ঝকমক করে উঠত। হঠাৎ বিপন্ন হয়ে সাধুবাবা তার বাঘের চামড়ার আসনের তলা থেকে "হাণ্ডগান" নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। সব সময়ই এঁদের প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হোত, ধরা পড়লে অনিবার্য মৃত্যু। মৃত্যুর আশংকা সম্মুখে নিয়েই এ দুঃসাহসিক প্রচারকের দল ব্যারাকপুর থেকে মীরাট, মীরাট থেকে এলাহাবাদ বা কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা, পেশোয়ার—যেখানে যেখানে সেনানিবাস আছে, সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে গিয়েছেন বা এক জায়গার গোপন খবর অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। এঁদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী কিন্তু লোকচক্ষের অগোচরেই থেকে গেছে।

এঁদের মধ্যে কোন কোন ফকীর দস্তুরমত হাতীতে চড়ে, শিষ্য মুরীদদের নিয়ে দলবলে ঘেরাও হয়ে বেরোতেন। একবার এক শহরে এ রকম একটা দল এসে হাজির। তাঁদের চালচলন ও কার্যকলাপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনে একটু সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তারা সে ফকীরকে তাঁর দলবল সহ শহর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য হুকুম দেয়। ফকীর সাহেব শান্তিপ্রিয় লোক সরকারী হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল যে তিনি সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সিপাইদের ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কেল্লা বা সেনানিবাসের কাছাকাছি জায়গায় প্রায়ই দেখা যেত কোথাও সাধুবাবা ধূনি জ্বালিয়ে বসে গঞ্জিকা সাধনায় ডুবে আছেন, কোথাও কোন ফকীর একাগ্রমনে কোরআন পাঠে নিরত, কোথাও বা কোন জ্যোতিষী ভাগ্যগণনার ফাঁদ পেতে বসে আছেন। হিন্দু মুসলমান সিপাইরা দলে দলে তাদের কাছে এসে ধন্না দিত, ভক্তিতে গদগদ হয়ে ধর্মোপদেশ ও তত্ত্বকথা শুনত। এই ধর্মকথার অন্তরালে লোক বুঝে বুঝে তাঁরা বিদ্রোহের বীজমন্ত্র দান করতেন।

শুধু সিপাইদের মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এঁদের প্রচারের ক্ষেত্র বিস্তারিত ছিল। কোন কোন জায়গায় ইংরাজদের নজরেও এ জিনিষটা

www.pathagar.com

পড়ল। তারা লক্ষ্য করল, 'যখনই সে অঞ্চলে কোন সাধু বা দরবেশ আসে, কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের চাকর-বাকর আর বাবুর্চি-আয়া মহলে একটা দুর্বিনীত ভাব দেখা দেয়। বাজারে ফিরিঙ্গীদের দেখলেই দেশী লোকেরা ফিস ফিস করে কি সব কানাকানি করে। পরের দিন ভিস্তির দেখা নেই, সাহেব সারাদিন পানি পান না। বলা নেই কওয়া নেই, আয়াগুলো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। মেমসাহেবের সামনে বাবুর্চি খালি গায়ে এসে দাঁড়ায়। সাহেবকে দেখে বয় সেলাম করে না, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন সাহেবকে দেখতেই পায়নি।' কিন্তু সাধু ও ফকীরেরা যে কোন রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে পারে, এ সন্দেহ তাদের মনে দেখা দেয়নি।

দেশী সিপাইদের মধ্যে ধর্মচর্চার ব্যবস্থার জন্য সরকার থেকে মৌলবী ও পুরোহিত নিযুক্ত করা হোত। শোনা যায় বিদ্রোহীদের পক্ষের অনেক লোক মৌলবী ও পুরোহিতের ছদ্মবেশে এদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

উত্তর ভারতে 'তামাসগার' বলে একটা সম্প্রদায় ছিল। এরা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তামাসা দেখিয়ে বেড়াত। বিদ্রোহীরা তাদের প্রচারের কাজের জন্য এদের সাহায্য নিত। এরা সাধারণতঃ ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বন করেই গান গাইত। এ ধরণের অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ সমস্ত গান শুনবার জন্য হাজার হাজার লোক এসে ভীড় করত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনত। এ সমস্ত ধর্মীয় কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে তারা স্বদেশপ্রেমের গান গাইত আর গানের মধ্য দিয়ে ফিরিঙ্গী বিদ্বেষ প্রচার করত।

ঝাঁকে ঝাঁকে ইশতাহার বের হচ্ছিল। কতগুলি অঞ্চলে ইশতাহার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হোত। ফৈজাবাদের বিদ্রোহী মৌলবী তো তরোয়াল আর লেখনী দুই-ই সমানভাবে চালিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত ইশ্‌তাহার অগ্নিবর্ষণ করত, মানুষকে পাগল করে দিত।

সে সব ইশ্‌তাহারের নমুনা আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়। বিদ্রোহের গতি ও প্রকৃতিকে বুঝবার জন্য সে সমস্ত ইশ্‌তাহারগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনে লাগত সন্দেহ নেই। মাদ্রাজ শহরের দেয়ালে এ ইশ্‌তাহারটি এঁটে দেওয়া হয়েছিল ঃ

www.pathagar.com

"স্বদেশবাসীগণ, স্বধর্মে অনুরাগীগণ, ওঠো, ফিরিঙ্গীদের দেশ থেকে ভাগিয়ে দেবার জন্য সবাই মিলে উঠে দাঁড়াও। ওরা ন্যায়কে পদদলিত করেছে আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে ওরা স্থির করেছে আমাদের জাতিকে ধুলির সাথে মিশিয়ে দেবে। এ ফিরিঙ্গীদের অসহনীয় অত্যাচার থেকে হিন্দুস্তানকে মুক্ত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে রক্তাক্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য জেহাদ, ন্যায়ের জন্য জেহাদ। যাঁরা এ যুদ্ধে জীবন হারাবেন, তাঁরা শহীদ বলে গণ্য হবেন। বেহেশতের দুয়ার শহীদদের জন্য সদাই উন্মুক্ত। কিন্তু যে সকল ভীরু দেশদ্রোহী এ জাতীয় কর্তব্য থেকে দূরে সরে যাবে, দোজখের আগুন সে সব দুর্ভাগাকে ঘিরে ফেলবে। স্বদেশবাসীগণ, এ দু'য়ের মধ্যে কোনটা তোমরা চাও? বেছে নাও—এখনই বেছে নিতে হবে।"

লক্ষ্ণৌ শহরের পার্কে পার্কে ইশ্‌তাহার যেতে লাগল। জনসাধারণের মনকে আলোড়িত করে তুলবার জন্য আবেগময়ী ভাষায় তাদের আহ্বান জানানো হোত ঃ

"হিন্দু ও মুসলমান, মিলিতভাবে উঠে দাঁড়াও! এই শেষবারকার মত তোমাদের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে নাও। এ সুযোগ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তবে আর দেশের মানুষের বেঁচে থাকবার কোন উপায় থাকবে না। এ হচ্ছে শেষ সুযোগ। পার তো এখনই কর নইলে আর নয়।"

সরকারী লোকেরা জানত প্রতিদিনই এ ধরণের নিত্য নতুন ইশ্‌তাহার বের হচ্ছে। দেখলেই তারা ছিঁড়ে ফেলত। তার বেশী আর করবেই বা কি! কিন্তু ছিঁড়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই কারা যেন আবার সে জায়গায় নতুন ইশ্‌তাহার লাগিয়ে দিয়ে যেত।

পুলিশ বলত এগুলো কারা লাগায় কখনই বা লাগায় এটা খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তার কারণটা কিছুদিন বাদেই জানা গেল। সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে যে! পুলিশের লোকদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই এ সমস্ত গোপন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। বিদ্রোহের উদ্দীপনা তাদেরও মাতিয়ে তুলেছিল।

www.pathagar.com

চাপাটি আর পদ্ম

দিল্লীর অন্তর্গত পাহাড়গঞ্জ থানার থানাদার মৈনুদ্দীন সাহেব তাঁর রোজনামচায় এক বিচিত্র অভিজ্ঞার কথা লিখেছিলেন ঃ ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। সবেমাত্র ভোর হয়েছে এমন সময় ইন্দ্রপৎ গ্রামের চৌকিদার এক রিপোর্ট নিয়ে এসে হাজির। অবাক হয়ে দেখি তার হাতে একখানা চাপাটি। এ আবার কি! এ চাপাটি সম্পর্কেই সে নাকি রিপোর্ট করতে এসেছে।

কি ব্যাপার?

সে বলল, "সেরাই ফারুক খান গ্রামের চৌকিদার এ চাপাটি খানা আমার হাতে এনে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। চাপাটিখানা দেবার সময় সে বিশেষ করে বলে দিয়েছে যে আমি যেন ঠিক এ রকম পাঁচখানা চাপাটি বানিয়ে পাশাপাশি পাঁচটি গ্রামে পাঠিয়ে দেই। আর যাদের কাছে পাঠাব, তাদের যেন একথা বলে দেই যে তারাও যেন প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচটা করে চাপাটি বানিয়ে পাঁচ পাঁচটা গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। যব বা গমের আটা দিয়ে এ চাপাটি বানাতে হবে। চাপাটিগুলোকে হাতের তালুর মত বড় করতে হবে ওজনে যেন দুই তোলার মত হয়।

অবাক হয়ে তার কথা শুনি। লোকটা বলে কি! তবে এটা বুঝতে পারলাম যে সে মিছে কথা বলছে না। ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে, একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে না। এ ধরণের ঘটনা ঘটলে হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের মনে আতংকের ভাব ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েকদিন যায়। অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটল না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই একটা জনরব শুনতে পেলাম যে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বহরমপুরে ১৯নং রেজিমেণ্ট টোটা নিতে অস্বীকার করেছে। ৩৪ নং রেজিমেণ্টেও ঠিক একই অবস্থা। ফলে রেজিমেণ্টের ৭টি কোম্পানীকে পদচ্যুত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

খবরটা শুনেই সন্দেহ হোল, ব্যাপার সুবিধার নয়, সামনেই একটা বিপদের দিন আসছে। এ সময় সংবাদপত্রে বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সিপাইদের চালচলন সম্পর্কে নানারকম খবর বের হচ্ছিল। অবস্থাটা কেমন যেন সঙ্গীন বলে মনে হতে লাগল। আমার থানা এলাকার চারদিকে খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠালাম যে অন্যান্য গ্রামগুলোতে চাপাটি এসে গেছে কিনা। সবাইকে নিষেধ করে দিলাম, কেউ যেন এই চাপাটি বিলি করার ব্যাপারে সাহায্য না করে।

আমার ছোট ভাই মীর্জা মহাম্মদ হোসেন খাঁ বুদ্দাপুরের থানাদার। বুদ্দাপুর দিল্লী থেকে ষোল মাইল দূরে। যেদিন আমি পাহাড়গঞ্জে চাপাটি বিলি করার সংবাদ পেলাম ঠিক সে দিনই আমার ভাই একজন ঘোড়সওয়ার সংবাদদাতাকে পাঠিয়ে আমাকে খবর দিল যে তার এলাকাতেও গ্রাম থেকে গ্রামে চাপাটি বিলি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো বকরীর গোশ্‌তও এ ভাবে বিলানো হচ্ছিল। এ অবস্থায় কি করা উচিত এ সম্পর্কে সে আমার মতামত জানতে চেয়ে পাঠিয়েছে।

আমি খবর পাঠিয়ে দিলাম, এ চাপাটি বিলি যাতে বন্ধ হয় সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে। সঙ্গে সঙ্গে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছেও খবর দিলাম। উপর থেকে নির্দেশ পেলাম, চাপাটি বিলি যাতে বন্ধ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখো।

সারা দেশ জুড়ে এ ব্যাপার চলছে কিনা তদন্ত করে দেখবার জন্য আমার ভাইকে আলীগড় ও মথুরায় পাঠানো হোল।

তদন্ত শেষ করে সে যখন ফিরে এল তখন তার মুখে শুনলাম যে এ ব্যাপারে খোঁজ করবার জন্য দিল্লীর অনেক জায়গাতেই সে গিয়েছে। যেখানেই গিয়েছে, সব জায়গাতেই চাপাটির খোঁজ পেয়েছে। যেখানেই খোঁজ করেছে সেখানেই শুনতে পেয়েছে চাপাটি এসেছে পূব দিক থেকে। কিন্তু কোথা থেকে এসেছে কোন উদ্দেশ্যই বা পাঠানো হয়েছে এর সঠিক জবাব সে কারো কাছেই পায়নি।

আমার ভাই বলল, অন্যান্য জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে এ সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ নেওয়া হোক অথবা আমাকে যদি পাঠানো হয় আমি একবার এর গোড়ার ঘরটা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

www.pathagar.com

আমার ভাই এ ব্যাপারটা নিয়ে ভলে করে তদন্ত করে দেখবার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উপরওয়ালারা এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে রাজী ছিলেন না।

কিছুদিন বাদে দিল্লীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্যার থিওফাইলাস মেটকাফ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে লিখলেন—এ চাপাটির ব্যাপারটার মূল কোথায়? এ সম্পর্কে তুমি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে কর আমাকে লিখে জানাও।

তার উত্তরে আমি তাঁকে জানালাম যে আমি আমার আব্বার মুখে শুনেছি মারাঠা শক্তির পতনের সময় চিনার মঞ্জরী ও রুটির টুকরো এ ভাবে গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হোত। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য থাকলে সাঁওতালেরাও এ ভাবে গ্রামের পর গ্রামে শালের মঞ্জরী পাঠিয়ে দিত। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব মতামত সম্পর্কে আমি লিখলাম, আমার ধারণা শীগগিরই খুব বড় রকমের একটা গোলমাল বাঁধবে।

মৈনুদ্দিনের এ রোজনামচা থেকে আমরা শুধু দিল্লী ডিভিশনেরই খবর পেলাম। কিন্তু এ রহস্যময় চাপাটি শুধু এ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এ চাপাটির কাহিনী শোনা গেছে। সরকারী অফিসাররা চাপাটিকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখতেন কিন্তু এর কোন কূল কিনারা করতে পারেন নি। অথচ এদেশের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয় এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। যখনই কোন বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছে, এ নিঃশব্দ চাপাটি তখন গ্রাম থেকে গ্রামে, হাত থেকে হাতে পরিক্রমণ করতে করতে আসন্ন বিদ্রোহের বাণী প্রচার করে ফিরেছে।

ভেলোরে যখন সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তখনও চাপাটির মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ চালানো হয়েছে। এ বিদ্রোহের দুতীরা বিদ্যুৎগর্ভ বাণী বহন করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে চলেছে, যাকেই স্পর্শ করেছে তাকেই বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। কোথা থেকে তারা আসত আর কোথায় যে চলে যেত একথা কেউ বলতে পারে না।

কোন কোন উৎসাহী সরকারী অফিসার চাপাটির রহস্য ভেদের জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এই চাপাটি আনিয়ে তাকে পিষে গুঁড়ো

www.pathagar.com

গুড়ো করে দেখেছেন তার মধ্য দিয়ে কোন গোপন খবর চলাচল হচ্ছে কিনা। কিন্তু নিঃশব্দ চাপাটির মুখ থেকে কোন কথা তাঁরা বের করতে পারেন নি, রহস্য রহস্যই থেকে গেছে। যাদের উদ্দেশ্য করে চাপাটি পাঠানো হোত, তারাই শুধু বুঝতে পারত চাপাটির মর্মকথা।

বিদ্রোহের বাণী প্রচার করে সবাইকে সজাগ করে তুলবার জন্য বাংলাদেশে চাপাটির পরিবর্তে আর একটি জিনিষকে ব্যবহার করা হোত। লালপদ্মকে তারা বিদ্রোহের প্রতীক বলে ধরে নিয়েছিলেন। লালপদ্মের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীরা অভ্যুত্থান সম্পর্কে তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করতেন।

তাঁবুর মধ্যে সিপাইরা বসে জটলা করছে এমন সময় কোথা থেকে একটি লোক এসে হাজির। হাতে তার একটি লালপদ্ম। লালপদ্মের ইঙ্গিত কেউ বুঝল কেউ বা বুঝল না। যারা বুঝল তাদের চোখে চোখে ইসারা খেলা করে গেল। রক্তপদ্ম আসন্ন ঝড়ের সংকেত বহন করে এনেছে। যে লোকটি এসেছিল, লাল পদ্মটিকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে সে যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে ফিরে চলে গেল। এবার এ তাঁবু থেকে একজন লোক পদ্মটিকে নিয়ে অন্য একটি তাঁবুর দিকে যাত্রা করল। এ ভাবে তাঁবু থেকে তাঁবুতে গ্রাম থেকে গ্রামে হাতে হাতে ঘুরতে থাকত সে পদ্ম, নিঃশব্দে বিদ্রোহীদের প্রস্তুতির কথা পরস্পরকে জানিয়ে দিত। বাংলা দেশে এমন কোন সেনানিবাস ছিলনা যেখানকার সিপাইরা এ লালপদ্মের দেখা পায়নি।

বৃটিশ ঐতিহাসিক ট্রেভেলায়ান তাঁর 'কানপুর' নামক বইটিতে লিখেছেন ঃ

"রক্তপদ্ম সমস্ত মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করে তুলছিল। বাংলাদেশে কি সিপাই, কি চাষী সবার মুখেই এ কথাটি শোনা যেত, সব লাল হো যায়গা! এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চোখে রহস্যময় অর্থপূর্ণ ইংগিত খেলা করে যেত।"

সব লাল হো যায়গা! রক্তপদ্মের রক্তিমা কি তারই ইংগিত?

সব লাল হো যায়গা!

কি দিয়ে লাল করা হবে?

এত রং যোগাবে কারা?

www.pathagar.com

মীরাটের বিদ্রোহ

দমদমের এক দেশী সিপাই স্নান করে এক লোটা পানি নিয়ে ব্যারাকে ফিরছিল। পথে এক ঝাড়ুদারের সঙ্গে দেখা। ঝাড়ুদারের তেষ্টা পেয়েছিল, সিপাইর কাছে পানি চাইল। সিপাইজী উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মন, তার কাছে ঝাড়ুদার অস্পৃশ্য। কি করে পানি দেবে, একটু ইতস্তত করতে লাগল। ঝাড়ুদার তিক্ত হাসি হেসে বলল—"মহারাজ এখনও জাতের বড়াই করো! তোমাদের জাত জন্ম কি আর থাকবে! সরকার বাহাদুর এবার নতুন টোটায় গরু আর শুয়োরের চর্বি মাখিয়ে দিচ্ছে। দাঁত দিয়ে কাটতে হবে সে টোটা। দেখা যাবে এবার তোমরা কি কর।"

সামান্য ঝাড়ুদারের কথা হলেও যে শুনল তার মনেই খটকা লাগল। দমদমের সমস্ত সিপাইদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। দমদমের সঙ্গে ব্যারাকপুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এ খবর ব্যারাকপুরে গিয়ে পৌঁছতে দেরী হোল না। সিপাইদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল।

কিন্তু এতো শুধু দমদম আর ব্যারাকপুরের কথা নয়! একই সঙ্গে সমস্ত ভারতময় এ নিয়ে তুমুল তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। কথাটা কি প্রথম বাংলা দেশ থেকে উঠেছিল, না আর কোন প্রদেশ থেকে উঠেছিল, নাকি একই সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠেছিল, এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। তবে বিদ্রোহীদের একটা নিপুণ প্রচার বাহিনী যে পিছন থেকে সংগঠিতভাবে কাজ করে চলেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

গভর্ণমেণ্ট ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে এ নতুন টোটা চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কথাটার মধ্যে সত্যতা থাক আর নাই থাক সিপাইরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হোল যে তাদের ধর্ম নষ্ট করবার জন্যই খৃষ্টান গভর্ণমেণ্ট এ দুরভিসন্ধিমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে সারা ভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত সিপাইদের মধ্যে এ নিয়ে যে

www.pathagar.com

বিক্ষোভ দেখা দিল তার বিস্তৃতি ও তীব্রতা দেখে গভর্ণমেণ্ট থমকে দাঁড়ালেন। ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বপ্রথম বহরমপুরের সিপাইরা এ টোটা ব্যবহার করতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করল। এ টোটার প্রশ্ন নিয়েই মীরাটের সিপাইরা বিদ্রোহ করেছিল।

২৩শে এপ্রিল তারিখে থার্ড লাইট ক্যাভেলরির ঘোরসওয়ার সিপাই-দের প্যারেডে জমায়েত করা হয়েছিল। এখানে সিপাইদের টোটা ব্যবহার করবার নয়া কায়দা শেখানো হচ্ছিল। কিন্তু নব্বই জন সিপাইর মধ্যে পঁচাশি জনই টোটা স্পর্শ করতে অস্বীকার করল। কর্তৃপক্ষ তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এ টোটা তাদের পুরানো টোটাই, কাজেই এগুলি সম্বন্ধে তাদের আপত্তি করবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু সে পঁচাশি জন সিপাই তাদের সংকল্পে অটল রইল। তারা অফিসারদের মুখের সামনে প্রকাশ্যে তাদের আদেশ অমান্য করল।

এতই দুঃসাহস!

সিপাইদের এ স্পর্ধায় কর্তৃপক্ষ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম দেওয়া হোল, অবিলম্বে এ পঁচাশি জন উদ্ধত সিপাইর হাতের অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে আর গা থেকে খুলে নিতে হবে তাদের সামরিক পোষাক।

এ পঁচাশি জন বিদ্রোহী হয়তো মনে মনে আশা করেছিল যে অন্যান্য সিপাই ভাইরা তাদের গায়ে হাত দিতে রাজী হবে না।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের আদেশ, কঠিন হাতে বিদ্রোহ দমন করতে হবে। গোলন্দাজ গোরা সৈন্যেরা সামনেই কামান সাজিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুকুম হলেই হয়।

উদ্যত কামানের মুখে দাঁড়িয়ে অন্যান্য সিপাইরা এ আদেশ লংঘন করতে সাহস করলনা। মনের গ্লানি মনেই চেপে রেখে তারা তাদের সহযাত্রী বিদ্রোহী ভাইদের গা থেকে পোষাক টেনে খুলে নিল। কোর্ট মার্শালের বিচারে এ পঁচাশি জন বিদ্রোহীকে শৃংখলাভংগের অপরাধে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোল।

সমস্ত শহরে এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। শহরের লোক বিক্ষুব্ধ,

www.pathagar.com

উত্তেজিত। ঘরের মানুষ পথের মানুষ সকলের মধ্যে এ একই আলোচনা, এ একই কথা নিয়ে বলাবলি। পঁচাশি জন বীর বন্দী শহরবাসী নরনারীর মন জয় করে নিয়েছে। সিপাইদের আন্দোলনের সঙ্গে জনসাধারণের প্রাণের যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনার মুখে এ মুহূর্তটি একটি চরম মুহূর্ত।

যে সমস্ত সিপাইরা তাদের বিদ্রোহী ভাইদের গা থেকে জোর করে সামরিক পোষাক খুলে নিয়েছিল, তারা রাস্তায় বেরিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারল না। সমস্ত শহরবাসীর ধিক্কারে তারা যেন মাটিতে মিশে গেল। এমন কি বাজারে মেয়েরা পর্যন্ত তাদের ডেকে ডেকে অপমান করতে লাগল—ছি, ছি, ছি, কাপুরুষের দল, নিজের ভাইদের গা থেকে পোষাক খুলে নিতে একটু বাধল না! তারা বীর, তারা সব জেলখানায় পচে মরছে আর তোমরা বেরিয়েছ হাওয়া খেতে! লজ্জা করে না, গলায় দেবার মত দড়ী জোটেনা!

সিপাইরা মনের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছিল। এ লাঞ্ছনা তারা আর সহ্য করতে পারছিল না। সে রাত্রেই গোপন পরামর্শ সভা বসল। সব স্থির হয়ে গেল—আর দেরী নয়, কালই।

পরদিন রবিবার। শহরের ইউরোপীয় অধিবাসীরা ও গোরা সৈন্যেরা সবাই গীর্জায় উপস্থিত ছিল। গীর্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু হতেই নির্ধারিত ব্যবস্থা মত সিপাইরা বিদ্রোহ করল। প্রথমেই থার্ড ক্যাভেলরি জেলখানায় গিয়ে জেলের দরজা ভেঙ্গে বন্দীদের বের করে নিয়ে এল। এতদিনের জমানো ক্রোধ এবার যেন ভেঙ্গে পড়ল। মহাবিদ্রোহের রক্তগঙ্গা এখান থেকেই প্রবাহিত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলল।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এভাবে অবাধে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সিপাইরা সে রাত্রিতেই দিল্লী দখল করবার জন্য ছুটল। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্তে বসেছিলেন, কোন খবরই রাখতেন না। বিদ্রোহী সিপাইরা নিজেরাই তরোয়ালও বন্দুকের আগায় এ খবর বহন করে নিয়ে এলো। দিল্লী অতি সহজেই তাদের দখলে এসে গেল। বিদ্রোহীরা রাজধানীর বুকে আজাদীর ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল।

www.pathagar.com

আজাদ দিল্লীতে ঈদ উৎসব

আজাদ দিল্লীর আকাশে ঈদের চাঁদ দেখা দেবে। একশো বছর পরে ঈদের চাঁদের পবিত্র আলোকচ্ছটা আজাদ দিল্লীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে। শহরের মুসলমান অধিবাসীরা আগ্রহে অধীর হয়ে এই পবিত্র দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে ঈদের দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন হডসন সাহেব আর সমস্ত বৃটিশ অফিসারেরা, যারা দিল্লী শহরকে অবরোধ করে ওঁৎ পেতে বসে কোন মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যায় তারই সুযোগ খুঁজছে। হডসন সাহেব একটা খবর পেয়েছেন, আর সেই খবরটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। ঈদের সময় শহরে গো-জবেহ্ নিয়ে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বেঁধে যাবার নাকি খুবই সম্ভাবনা। এ দাঙ্গাটা যদি সত্যিই বেধে যায়, বা কোনমতে বাধিয়ে দেওয়া যায়, তাইলে সহজেই কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে। এ হচ্ছে এক চমৎকার মওকা।

শহরের ভিতর থেকে ইংরাজদের গুপ্তচরেরা সংবাদ পাঠাচ্ছে অবস্থা নাকি খুবই আশাপ্রদ। ভিতরে খুবই গোলমাল আর দলাদলি চলেছে। একদল মুসলমান ঘোষণা করেছে যে, যে করেই হোক ঈদের দিনে জুম্মা মসজিদে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী গরু জবেহ্ তারা করবেই। আশা করা যাচ্ছে তাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাসকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর তা যদি হয়, তাহলে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বেধে যাবেই, কেউ তাকে আটকাতে পারবে না!

ঈদ উপলক্ষে গো-জবেহ্ বন্ধ করে দেওয়া হলে স্বভাবতঃই মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে। আবার হিন্দুদের মনে গোহত্যার বিরুদ্ধে সংস্কার এতই প্রবল যে গোহত্যা বন্ধ না হলে বিদ্রোহী হিন্দু সিপাইরা বেঁকে বসতে পারে। অথচ এক সংকটের সময় এ ঐক্যবদ্ধ

www.pathagar.com

সংগ্রামের মধ্যে কোনরকমে যাতে ফাটল ধরতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়াই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যাঁরা তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে হিন্দুরা যাতে দূরে সরে যায়, এমন কোন কাজ করা সংগত হবে না। ঠিক এ দিকে দৃষ্টি রেখেই খান বাহাদুর খান বেরিলীতে ঘোষণা করলেন যে, হিন্দুরা যদি বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে যোগদান করে, তাহলে রাজ্যে গোহত্যা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এ ঐক্য রক্ষা করবার জন্য বাদশাহ কত দূর পর্যন্ত যেতে পারেন? তিনি যেটাই করেন না কেন, এক পক্ষ তার বিরুদ্ধে থাকবেই। এতদিনের প্রচলিত প্রথাকে বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে হাকিম আহ্‌সানুল্লাহ্‌ও ইতঃস্তত করছিলেন। তিনি মৌলবীদের পথেই পা বাড়াতে চলেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ এসময় এ ব্যাপারে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন ঃ

"ঈদ উপলক্ষে শহর এলাকার মধ্যে কোন গরু জবেহ করা চলবে না। যদি কোন মুসলমান এ কাজ করে, তাহলে তাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং আর কোন মুসলমান যদি এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে তবে তাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

বাদশাহ্‌ ঈদগাহে একটা ভেড়া কোরবানী করে নিজেই তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ফলে পয়লা আগষ্ট, ঈদের দিনে দিল্লীতে কোন রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল না। সকাল বেলা যথারীতি ঈদের জমায়েতে নামায পড়া হোল।

কোনও দিকে কোন রকম শান্তি ক্ষুন্ন হোল না। কিন্তু এজন্য কত লোক যে মনঃক্ষুণ্ন হোল! পর দিন মিঃ কীথ ইয়ং তাঁর স্ত্রীর কাছে চিঠিতে লিখলেনঃ গতকাল ঈদ উৎসব উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বড় রকমের একটা হাংগামা বাধবে এ আশা আমরা খুবই করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এ আশা পূর্ণ হয় নি। কাল শহর থেকে একটি মাত্র সংবাদলিপি পাওয়া গেছে তাতে এ ধরণের কোন কথাই নেই। বাদশাহ শহরে গোহত্যা বন্ধ রাখবার জন্য কড়া আদেশ জারী করেছিলেন। এ

www.pathagar.com

আদেশ যদি প্রতিপালিত হয়ে থাকে তাহলে হিন্দুরা খুবই খুশী হবে এবং হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করবার পরিবর্তে উভয়ে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আক্রমণ চালাবে।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়ে আপনার আপনার কাজ হাসিল করে নেওয়া, এটা বৃটিশের নতুন আয়ত্ত করা বিদ্যা নয়। যেদিন ভারতের মাটিতে পা দিয়েছে, সেদিন থেকেই সে এ খেলা খেলে আসছে। সে খেলার আমরাই ছিলাম খেলনা। কিন্তু মহাবিদ্রোহের সময় তার আশা ও প্রচেষ্টা দুই-ই সমানভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

১৮৫৭ সালের পয়লা মে স্যার হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে আছে ঃ

"দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ বাধবে, আমি তার অপেক্ষায় আছি।" তাঁর এ আশা পূর্ণ হয়েছিল কি ?

মিঃ এইচসন্ তার জবাব দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন ঃ

"এক্ষেত্রে মুসলমানদের আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছি !"

www.pathagar.com

এলাহাবাদের বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এলাহাবাদ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শুধু সিপাইদের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও, শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও বিদ্রোহের শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল।

এখানে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা ছিল এ বিষয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম পরিচালনায় তারা ছিল ওস্তাদ। এলাহাবাদে এ গোপন সংগঠন এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, শুধু সাধারণ লোকেরা নয় শহরের বহু বিশিষ্ট লোক এমন কি জজ-মুনসেফরা পর্যন্ত এ সমস্ত গুপ্ত সমিতির আওতার মধ্যে এসে গিয়েছিলেন।

একটা ব্যাপারে এলাহাবাদের বিদ্রোহীরা অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্রোহীদের টেক্কা মেরেছে। সে হচ্ছে তাদের গোপন কর্মকৌশল। এর তুলনা কোথাও মিলবে না। যে সকল নেতা ও কর্মীরা চারদিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন, সরকার পক্ষ তাঁদের সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ পোষণ করে নি। সারা দেশ যখন বিদ্রোহের জোয়ারে টলমল করে উঠেছে, এলাহাবাদে তখন পূর্ণ শান্তি বিরাজমান। এখানে যে ইংরাজ ফৌজ মোতায়েন করবার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে, একথা কারো মনেই আসেনি।

দিল্লী শহর মীরাটের বিদ্রোহী সিপাইদের দখলে এসে গেছে, এলাহাবাদে এ খবর যখন এসে পৌঁছল, এখানকার বিদ্রোহীদের দলপতিরা অফিসারদের কাছে গিয়ে তাদের ব্যগ্র কামনা নিবেদন করল ঃ খাবন্দ, একবার আমাদের দিল্লী যাবার জন্য হুকুম দিন। দেখে নেব ব্যাটাদের একবার, কেটে কুচি কুচি করে গঙ্গার পানিতে ভাসিয়ে দেব। ব্যাটাদের বড় বাড় বেড়েছে, এ আর আমাদের সহ্য হয় না।

প্রভুভক্তির এই উচ্ছল উচ্ছ্বাসে প্রভুরা অভিভূত হয়ে পড়লেন।

স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল ৬ নং রেজিমেণ্টের এ অতুলনীয় বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির জন্য তাদের প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ জানাবার নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

ঠিক সে সময় কোন একজন নাগরিকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা সংবাদ এসে পৌঁছল। সংবাদটা অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য। ৬নং রেজিমেণ্টের সিপাইরা নাকি গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে।

কি যে বলে, যত সব বাজে গুজব!

তবু একবার তদন্ত করে দেখা দরকার। ইংরাজ অফিসাররা ৬ই জুন তারিখে লাইন পরিদর্শনে এলেন। নাঃ, কোথায় কি, যেদিকেই তাকান, চোখ জুড়ানো দৃশ্য। সিপাইদের হৃদয় রাজভক্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ। আর লোকগুলোরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কেবল বাজে গল্প রটিয়ে বেড়ায়।

কয়েকজন সিপাইর প্রেম যেন কুল ছাপিয়ে উঠল, তারা দৌড়ে গিয়ে অফিসারদের জড়িয়ে ধরল, দুই গালে সস্নেহ চুম্বন ঢেলে দিল।

এত মাখামাখি, কালায় আর গোরায়, সিপাই আর অফিসারে। ভুললে চলবে না, সে বিষম সংকটের দিনে সিপাইদের ভালবাসার মত মহামূল্য জিনিস গোরা অফিসারদের কাছে আর কিইবা থাকতে পারে!

অফিসাররা মুগ্ধ হয়ে ফিরে এলেন।

সে রাত্রিতেই।

হ্যাঁ, সে রাত্রিতেই ৬ নং রেজিমেণ্টের সিপাইরা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। শত শত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল—মারো ফিরিঙ্গীকো!

সে রাত্রিতে সিপাইদের সস্নেহ চুম্বনে পরিতৃপ্ত নিশ্চিন্ত-চিত্ত গোরা অফিসাররা ডিনারের টেবিলে এসে জমায়েত হয়েছেন। হঠাৎ তীব্রস্বরে বিউগল বেজে উঠল। দারুণ বিপদের সংকেত! অফিসাররা খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

প্রভুভক্ত ৬নং রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে!

আউধ ক্যাভেলরিকে পাঠানো হোল বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্য। ঘোড়সওয়ার দল উদ্ধত বিদ্রোহী সিপাইদের মুখোমুখী এসে দাঁড়াল। একটি সংকটময় মুহূর্ত! ইংরাজ অফিসার গর্জন করে উঠলেন—এ্যাটাক! কই, কেউ একটু নড়ল না তো। আপনার দেশের ভাইকে

www.pathagar.com

হত্যা করবার জন্য একটি সওয়ারও তার কোষ থেকে তরোয়াল মুক্ত করল না। তারা নিঃশব্দে অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল! ৬নং রেজিমেণ্টের সিপাইরা তাদের সওয়ার ভাইদের অভিনন্দন জানিয়ে মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলল।

সমস্ত এলাহাবাদ শহর বিদ্রোহীদের হাতে চলে এসেছে। কিন্তু মূল জায়গাতেই গলতি। এলাহাবাদের কেল্লা এখনো রাজভক্ত শিখ সৈন্যদের হাতেই রয়ে গেছে। তাকে মুক্ত করা যায়নি।

সমস্ত এলাহাবাদ একই সঙ্গে জেগে উঠেছে। এখানকার তালুকদারেরা অধিকাংশই মুসলমান, প্রজারা হিন্দু। এক নম্বর হিন্দু-মুসলমান, দু নম্বর প্রজা-জমিদার। এ দু সম্প্রদায় যে কখনো একত্রে মিলতে পারবে এবং সমস্ত জনসাধারণ যে তাদের বিরুদ্ধে এক্‌কাট্টা হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, ইংরাজরা স্বপ্নেও একথা ভাবতে পারে নি। কিন্তু জুনের সে স্মরণীয় সপ্তাহে কত অসম্ভবই না সম্ভব হয়ে গিয়েছে!

এলাহাবাদের গ্রাম-অঞ্চলগুলি শহরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল না। তারাও একই সঙ্গে মাথা তুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

অনেক জায়গাতেই একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের কাজ সম্পন্ন হবার পর পরবর্তী পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ শাসন পরিচালনা করবার মত উপযুক্ত লোকের অভাবে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ভেঙ্গে পড়ে।

এলাহাবাদে এ রকম উপযুক্ত লোকের অভাব হয় নি। সংকট মুহূর্তে একজন লোক সামনে এগিয়ে এলেন। নাম তাঁর লিয়াকত আলী। এলাহাবাদের মৌলবী বলে পরিচিত। তিনি তাঁর শক্ত হাতে বিদ্রোহের রাশ চেপে ধরলেন।

এ অসাধারণ লোকটি সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা গিয়েছে। এটুকু জানা গিয়েছে যে তিনি ইতিপূর্বে তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন। বিদ্রোহের আগে তিনি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর পবিত্র জীবনের জন্য লোকসমাজে তাঁর অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা ছিল।

এলাহাবাদ স্বাধীন হোল। তার কয়েকদিন পরেই চৌবিশ পরগণার জমিদার লিয়াকত আলীকে ডাকিয়ে এনে শহরের ভার তাঁর উপর ছেড়ে

www.pathagar.com

দিলেন। দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

মৌলবী খসরুবাগে তাঁর প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করলেন এবং সারা প্রদেশব্যাপী বিদ্রোহকে সংগঠিত করে তুলবার কাজে হাত দিলেন। তাঁর পরিচালনায় কাজকর্ম সুশৃংখলভাবে চলল।

তিনি যে দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ একজন সুবাদার, একথা তিনি শুধু মুখেই বলতেন না, শেষদিন পর্যন্ত সুবাদার হিসাবে সম্রাটের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করে এসেছেন।

ক্ষমতা হাতে আসতেই, তিনি প্রথমেই যে জরুরী কাজটি অসমাপ্ত ছিল তাতে হাত দিলেন, অর্থাৎ শত্রুর হাত থেকে এলাহাবাদের কেল্লাকে পুনরায় দখল করবার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি একটি সৈন্যদল গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঠিক এ সময় সংবাদ পাওয়া গেল জেনারেল নীল বারানসী থেকে এলাহাবাদ যাত্রা করছেন। ১৭ই জুন তারিখে ইংরাজ সৈন্যরা শহরের দরজায় এসে ঘা মারল।

তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে মৌলভী সম্রাটের কাছে রিপোর্ট দিচ্ছেন ঃ

'যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক দল ছেড়ে শত্রুর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ লোকের কাছে গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে ইংরাজরা সমস্ত শহরটাকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেবে। প্রাণের ভয়ে সব লোক ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

ইংরাজরা খসরুবাগ আক্রমণ করল। প্রথম দিনের মত বিদ্রোহীরা সে ধাক্কা সামলে নিল। কিন্তু মৌলবী দেখলেন বৃথা চেষ্টা! কেল্লা যখন শত্রুদের হাতে, তখন খসরুবাগের এ জীর্ণ আশ্রয়ে বসে আত্ম-রক্ষা করবার চেষ্টা নিতান্ত পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭ই তারিখে মৌলবী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কানপুর যাত্রা করলেন। আর তার পরদিন ইংরাজরা এলাহাবাদ এসে প্রবেশ করল।

এলাহাবাদ শহর হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবু বিদ্রোহীরা হাল ছাড়ল না। সারা প্রদেশে গ্রামে গ্রামে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লাগল।

www.pathagar.com

এলাহাবাদের সাধারণ মানুষ সেদিন সমস্ত প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছিল। ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু মাথা নোয়াল না।

এলাহাবাদের সাধারণ মানুষ সেদিন সমস্ত জাতির মানরক্ষা করেছে। কিন্তু আমরা সে গৌরবময় ইতিহাসকে ধরে রাখতে পারিনি। আমরা দুর্ভাগা।

তাদের সে বজ্রদৃঢ় একতাকে ভাঙ্গবার জন্য শত্রুপক্ষ একদিকে অত্যাচার আর একদিকে প্রলোভন, এ দ্বিমুখী অভিযান চালিয়েছে।

একদিন মহৎ আদর্শের জন্য তাদের এ নির্ভীক সংগ্রাম দেখে একজন ইংরাজ অফিসার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কোন একটি গ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখছেন ঃ

'ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করে দিয়েছেন যদি কেউ স্থানীয় বিদ্রোহীদের নেতাকে জীবিত অবস্থায় অথবা তার মাথা কেটে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ অঞ্চলের লোকেরা সবাই তাকে চেনে কিন্তু আমাদের প্রতি ঘৃণা তাদের এতই তীব্র যে তাকে ধরিয়ে দেবার মত লোক এখানে কেউ নেই।'

সে সময় এখানে ইংরাজদের কাছে কোন জিনিস বিক্রী করা গুরুতর পাপের কাজ বলে বিবেচিত হোত। কেউ এ অপরাধ করলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে তাকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হোত। জনৈক অফিসার লিখেছেন, 'দেশের প্রতিটি মানুষ যদি এ ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে আর আমাদের ভরসা কি।'

এ হচ্ছে ২৩শে জুনের খবর। ওরা এলাহাবাদ শহর দখল করে নিয়েছে একথা সত্য কিন্তু ওদের শহর থেকে বাইরে এক পা বেরোবার উপায় নেই।

"এরা বলদ পায়না, এমন কি ওষুধ পর্যন্ত না। রুগ্ন সৈন্যদের জন্য ডুলীর যোগাড় করতে পারে না, কে এদের বয়ে নিয়ে যাবে! ইংরেজ-দের কাছে এক দানা শস্য বিক্রি করবে, এমন লোক কেউ নেই।"

www.pathagar.com

"আজ পর্যন্ত খেতে আমরা খুব কমই পেয়েছি। কাল সকালে যা দিয়ে নাস্তা করেছি, আগে হলে আমার কুকুরটাকেও আমি তা দিতে পারতাম না।'

সাধারণ মানুষের মধ্যে আপনাদের আদর্শ সম্পর্কে কি পরিমাণ দৃঢ় সংকল্প ও শত্রুর বিরুদ্ধে কি প্রবল ঘৃণা থাকলে এ ধরণের সর্বাঙ্গীন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়, সে কথা ভাবতে গেলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। এলাহাবাদ সেদিন এদিক দিয়ে সমস্ত দেশের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী মৌলবী

দাবানল যেমন লকলকে শিখায় বনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ায়, বিদ্রোহী মৌলবী যেন তারই প্রতিমূর্তি।

শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষা বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। মৌলবীর নাম বিদেশী শাসকদের কাছে পরম আতংকের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অযোধ্যা প্রদেশের অখ্যাত, অজ্ঞাত, সামান্য একজন তালুকদার। কেই বা তাঁকে চিনত, কেই বা জানত এ শান্ত, সৌম্য মানুষটির বুকের মধ্যে কি বিপুল তেজঃপুঞ্জ সংহত হয়ে আছে! স্তূপীকৃত বারুদরাশি, তার মধ্যে কত বড় শক্তিই না লুকিয়ে থাকে! একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

ডালহাউসীর সর্বগ্রাসী নীতি এ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করল। স্বেচ্ছাচারী রাজপ্রতিনিধি কতগুলি মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে অযোধ্যাকে আত্মসাৎ করে নিল, বহু তালুকদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদ শাহ সে তালুকদারদেরই এক জন। মৌলবী পথে এসে দাঁড়ালেন, সেদিন থেকে পথই হোল তাঁর আশ্রয়। সারা দেশ জুড়ে কোম্পানীর অত্যাচার ও লুণ্ঠন চলছিল, তার দিকে তাকিয়ে ভ্রুভঙ্গি করলেন, "এ জুলুমবাজ ফিরিঙ্গীরাজকে খতম কর", সিংহগর্জনে গর্জে উঠলেন।

মৌলবী ধর্মপথের পথিক। কিন্তু মানুষের সুখ দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে বসে ধ্যানধারণা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখাকেই তিনি ধর্ম বলে মনে করতেন না। তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র ছিলঃ

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

www.pathagar.com

সে দিন থেকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজের কায় মন প্রাণ—নিজের সর্বস্বের মায়া ছেড়ে দিয়ে তিনি এ ধর্ম পালন করে চলেছেন।

হতাশায় হাল ছেড়ে দেওয়া, ভেঙ্গে পড়া মানুষকে কি করে নতুন আশায় ও উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুলতে হয়, সে মন্ত্র তাঁর জানা ছিল। নিঃস্ব ফকীরের বেশে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, প্রদেশে প্রদেশে, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিদ্রোহের বাণী প্রচার করবার জন্য। অদ্ভুত তাঁর আকর্ষণী শক্তি! যেখানে যেতেন সেখানেই শহরের মানুষ গাঁয়ের মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, মূর্খ মানুষ দলে দলে এসে তাঁর চারদিকে ভীড় করে দাঁড়াত। ঘুমন্ত মানুষের চোখের ঘুম তিনি কেড়ে নিতে পারতেন। হ্যাঁ, এমন মানুষ ছিলেন মৌলবী। অ-বোলা মানুষের মুখে কথা ফোটাতে পারতেন তিনি, তাঁকে দেখলে দুর্বল মানুষও সবল হয়ে উঠত। লোকে বলত, মৌলবী সাহেব? অদ্ভুত তাঁর কেরামত! তাঁর হাতের ছোঁয়া পেলে মরা হাড়েও প্রাণ জেগে ওঠে। কথাটা মিথ্যে নয়।

অযোধ্যার জনসাধারণ তাঁকে তাদের প্রাণের মানুষ বলে মনে করত। একবার তিনি প্রকাশ্যে লক্ষ্ণৌ শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ফিরিঙ্গির রাজত্বকে ধূলিসাৎ করে দেবার জন্য, বজ্রনির্ঘোষে পবিত্র জেহাদ ঘোষণা করলেন। সে আহ্বানে জোয়ারের টানে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত জনতার প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

শুধু বক্তৃতাই নয়, সাথে সাথে তাঁর লেখনীও অবিরাম অগ্নি বর্ষণ করে চলল, তাঁর লেখা বৈপ্লবিক ইশ্‌তাহারে সারা অযোধ্যা প্রদেশ ছেয়ে গেল।

হুকুম জারী হোল, গ্রেফতার করো মৌলবীকে।

অযোধ্যার এ জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করতে ভরসা পেল না। তখন তাঁকে ধরে আনবার জন্য সৈন্যদল পাঠানো হোল।

তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়ে গেল। মৌলবী আহমদ শাহ ফৈজাবাদের কারাগারে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু বাতাস হয়ে উঠেছে এলোমেলো, পুরানো যা কিছু ছিল, সবই যেন উল্‌টে গিয়েছে। কে কাকে দণ্ড দেবে, কাল যে ছিল দণ্ডবিধাতা আজ সে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে, ওখানে, সেখানে, যেদিকে কান পাতো, শোনা যাবে বিদ্রোহের পদধ্বনি।

যারা এতদিন ভয়ে কথা বলত না, তারাও আজ গর্জন করে উঠেছে।

ফৈজাবাদের মানুষ তাদের জনপ্রিয় নেতার উপর এ হামলা নিঃশব্দে মাথা পেতে নিল না। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার ফলে, যে আগুন হয়তো বা আরও দুদিন পরে জ্বলে উঠত, সেটা এখনই জ্বলে উঠল। সিপাই ও নগরবাসীরা একই সঙ্গে রুখে দাঁড়াল।

ইংরাজ অফিসাররা সিপাইদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে প্যারেড ময়দানে জমায়েত হবার জন্য হুকুম দিলেন। সিপাইরা সে কথা গ্রাহ্য করল না, বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল, এখন থেকে দেশী অফিসার ছাড়া তারা কারো কথা মানবে না।

সরদার দলীপ সিং ইংরাজ অফিসারদের আটক করবার জন্য হুকুম দিলেন। শহর বিদ্রোহীদের অধিকারে এসে গেল। জনসাধারণ ও সিপাইরা জয়ধ্বনি করে জেলের দরজা ভেঙ্গে তাদের নেতাকে বের করে নিয়ে এল। জনগণের নেতা আবার জনগণের মধ্যে ফিরে এলেন।

মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের নেতৃত্বের ভার তাঁর উপরে এসে পড়ল।

—যারা তাঁকে এ পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে কি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি?

এমন এক প্রতিশোধ, যে কথা তাঁর শত্রুরা কোনদিন ভুলতে পারবে না।

তিনি যখন মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবাসে দিন যাপন করছিলেন, সে সময় কর্ণেল লেনক্স তাঁকে তামাক খাবার জন্য একটি গুড়গুড়ী উপহার দিয়েছিলেন। এ কর্ণেল লেনক্সই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মৌলবী কর্ণেল লেনক্সকে লোক মারফৎ বলে পাঠালেন ঃ

"তুমি যে আমার সে দুঃসময়ে গুড়গুড়ীটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলে, সেজন্যে শোকরিয়া জানাচ্ছি।"

শুধু তাই নয়, মহাপ্রাণ মৌলবী সমস্ত বন্দী ইংরাজ অফিসারদের মুক্তির আদেশ দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফৈজাবাদ ছেড়ে চলে যাবার জন্য হুঁশিয়ারী পাঠালেন। ১৫নং রেজিমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত যুদ্ধ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সমস্ত বন্দী ইংরাজ অফিসারদের হত্যা করতে হবে। কিন্তু মৌলবী তাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হোল না। অফিসারদের ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রত্যেককে পথ খরচা দিয়ে দেওয়া হোল।

লক্ষ্ণৌ শহর আক্রমণের মুখে। স্যার কলিনের নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্যেরা গঙ্গা পার হয়ে এগিয়ে এসেছে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল দুর্দান্ত তাঁতীয়া টোপীর সৈন্যরা কানপুরের উপর চাপ দিতে শুরু করেছে। স্যার কলিন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কানপুরকে এমন বিপদের মুখে ফেলে রেখে আর সামনে এগিয়ে যাওয়া চলেনা। চার হাজার সৈন্য সহ আউটরামকে আরামবাগে রেখে তিনি তাঁতীয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতে কানপুরের দিকে ফিরলেন।

আরামবাগের এ চার হাজার সৈন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। কোন দিক থেকে তাদের সাহায্য করবার মত কেউ ছিল না। লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহীদের পক্ষে এ ছিল একটা স্বর্ণ সুযোগ। সংগঠিত ভাবে আক্রমণ চালাতে পারলে এ সামান্য সংখ্যক ইংরাজ সৈন্যের টিকে থাকবার কোনই উপায় ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহীদের নিজেদের ভিতরকার অবস্থা তখন নিতান্তই শোচনীয়। নানা জায়গা থেকে হরেক রকমের লোক এখানে এসে জড় হয়েছে। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, কেউ কারো কথা মানতে চায় না, যে যার খুশীমত চলছে। বেগম হজরতমহল সরকারী-ভাবে সর্বাধিনায়িকা বলে স্বীকৃত হলেও এদের সবাইকে সামাল দিয়ে রাখা এবং এদের সংগঠিত ও পরিচালিত করবার মত সুকঠিন কাজ তাঁর ক্ষমতার বাইরে ছিল। কাজেই এমন চমৎকার সুযোগ থাকলেও তাকে কাজে লাগানো গেল না।

www.pathagar.com

দিল্লীর পতন হয়েছে, কানপুরের পতন হয়েছে, ফতেগড়ও সে একই পথ অনুসরণ করেছে। হাজার হাজার বিদ্রোহী সিপাই অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাড়া খেয়ে এখানে এসে জড় হয়েছে। কিন্তু তারা আসার ফলে লক্ষ্ণৌর কোন সাহায্য হওয়া দূরে থাক, তারা এখানে এসে নানা রকমের উৎকট সমস্যার সৃষ্টি করে তুলছিল। এ সমস্ত দেখে শুনে মানুষের মন ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়ছিল। ক্রমে ক্রমে এ ধারণাটা সবাইকে পেয়ে বসছিল যে এবার যখন ইংরাজ সৈন্যরা আরও নতুন সৈন্য নিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে আক্রমণ চালাবে, তখন আর তাকে বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মনে মনে অনেকেই ভাবছিল, লক্ষ্ণৌর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

কিন্তু মৌলবী কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে পড়তেন না। যারা তাঁর সহযাত্রী ছিল, তাদেরও তিনি ভেঙ্গে পড়তে দিতেন না।
তিনি একথাই বার বার করে সবাইকে বোঝাতে লাগলেন, এখনও একমন হয়ে কাজে লাগলে ইংরাজকে হারানো যেতে পারে।

বেগমের দরবারের লোকেরা একদম হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছে, তিনি তাদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। সৈন্যদের মধ্যে শৃংখলার নাম মাত্র নাই, তিনি চেষ্টা করতেন কি করে শৃংখলা ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধায় পড়তে হোত তাঁকে। দরবারের মধ্যে তাঁর প্রভাব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে কিছু কিছু লোক তাঁকে হিংসা করত। তারা তাঁর পিছনে উঠে পড়ে লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করতে হয়।

কিন্তু সিপাইদের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। স্বয়ং বেগমেরও বোধ হয় এতটা ছিল না। দিল্লী থেকে যে সব সিপাইরা এসেছিল, তারা একবাক্যে তাঁর কথা মান্য করে চলত। এ সমস্ত সিপাইর চাপে পড়ে বেগম তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

তাঁর মুক্তির পর যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ এখন আমাদের করণীয় কি ?

www.pathagar.com

তার উত্তরে তিনি বলেন, "যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল, আজ আর তা' নেই, সব কিছুই গড়বড় হয়ে গেছে। তবে ফলাফল যাই হোক না কেন, যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে একমাত্র এ কারণেই যে, যুদ্ধ করাটাই আমাদের কর্তব্য।"

লক্ষ্ণৌর জনসাধারণের উপর তাঁর যে প্রভাব ছিল, তা' কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। সিপাইদের নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ বা মনোমালিন্য চলত, সেগুলি মিটিয়ে দেবার ভার তাঁকেই নিতে হোত। সমস্ত প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও তিনিই তাদের মধ্যে নতুন করে প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করে তুলতেন।

কিন্তু এখানেই তাঁর কাজের শেষ ছিল না। এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পরিচালনা করবার কাজটা তাঁকেই প্রায় করতে হোত। আরামবাগে ইংরাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সিপাইরা যখনই আক্রমণ চালিয়েছে, মৌলবীকে সব সময়ই তাদের পুরোভাগে দেখা যেত।

১৫ই জানুয়ারী খবর পাওয়া গেল আরামবাগে আউটরামের সৈন্যদের সাহায্যের জন্য কানপুর থেকে একদল ইংরাজ সৈন্য আসছে, তাদের সঙ্গে প্রচুর রসদপত্র আছে। কি করে এদের মাঝপথে ঠেকিয়ে রাখা যায়, এ নিয়ে আলোচনা সভা বসল।

শুধু আলোচনা, আলোচনা আর আলোচনা! শুধু কথা আর কথা! কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো গেল না, কোন কর্মপন্থা গৃহীত হোল না। কাজের কথা এলেই সবাই যেন পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চায়।

অন্যান্য নেতাদের কাপুরুষতা দেখে অধৈর্য হয়ে উঠলেন মৌলবী। ঘৃণায় ও ক্ষোভে তিনি যেন ফেটে পড়লেন। সকলের সম্মুখে শপথ করলেন, তিনি নিজেই যাবেন, শত্রুপক্ষের নিকট থেকে মাল পত্র হস্তগত করে ইংরাজ সৈন্যদের মধ্য দিয়েই তিনি ফিরে আসবেন।

এ সংকল্প নিয়ে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে যতটা সম্ভব আত্মগোপন করে মৌলবী কানপুরের পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু গুপ্তচরের মারফৎ জেনারেল আউটরামের কাছে এ খবর আগেই পৌঁছে গেছে। মৌলবীর সৈন্যদের বাধা দেবার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধ বাধল।

সৈন্যদের উৎসাহিত করবার জন্য মৌলবী সবার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ একটা গুলী তাঁর হাতে এসে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ইংরাজেরা অনেকদিন থেকেই তাঁকে বন্দী করবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তারা তাঁকে বন্দী করতে পারল না। তাঁর সৈন্যেরা চটপট একটা ডুলীতে তুলে দিয়ে তাঁকে লক্ষ্ণৌতে পাঠিয়ে দিল।

লক্ষ্ণৌ শহরের পতন ঘটেছে। বিদ্রোহীদের যুদ্ধে পরাজিত করে ইংরাজ সৈন্যেরা লক্ষ্ণৌ অধিকার করে নিয়েছে। স্যার কলিন এ আনন্দে মশগুল হয়ে ছিলেন। কিন্তু এ আনন্দের মাঝখানে একটু যেন খাদ মেশানো ছিল। যে হাজার হাজার বিদ্রোহী সৈন্যদের তারা ঘেরাও করে ফেলেছিল একদিকের বেষ্টনী ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীদের অনেক নেতাও ছিলেন তার মধ্যে। খোদ অযোধ্যার বেগম সাহেবাও এ পথ দিয়েই পালিয়েছেন। মস্ত বড় একটা দাঁও ফসকে গেছে!

কিন্তু মৌলবী আহমদ শাহ্ কোথায়? পলাতক সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মাথা গুঁজবার আশ্রয় খোঁজ করছেন? না, তাঁর বিশ্রামের সময় এখনো আসেনি। ওই দেখো, চেয়ে দেখো, আর সব বিদ্রোহীরা যখন লক্ষ্ণৌ থেকে দূরে, অনেক দূরে উধাও হয়েছে, মৌলবী আহমদ শাহ্ তখন সে লক্ষ্ণৌ শহরের মধ্যেই এসে ঢুকে পড়েছেন।

এও কি সম্ভব? মৌলবীর পক্ষে কি যে সম্ভব নয়, বলা কঠিন। চারদিকে শত্রু সৈন্য গিজগিজ করছে, ভয় নেই প্রাণে? না, সত্যিই ভয় নেই। ভয় কাকে বলে মৌলবী তা জানেন না। মৌলবী কি উন্মাদ? এ কথাই ঠিক। মৌলবী সত্য সত্যই উন্মাদ। দেশপ্রেমে উন্মাদ। শুধু নিজেই নন, যাদের মধ্যে যান, তাদের শুদ্ধ উন্মাদ করে তোলেন। তাঁরই সহচর, তাঁরই মত উন্মাদ একদল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে আবার ঢুকে পড়েছেন লক্ষ্ণৌ শহরে, শত্রুপুরীর মাঝখানে।

লক্ষ্ণৌর পতন হয়েছে, ইংরেজদের হাতে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে, এ অবিসংবাদিত সত্যটিকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। লক্ষ্ণৌ শহরের বুকের উপর ইংরাজেরা যথেষ্ট অত্যাচার চালিয়ে

www.pathagar.com

যাবে, ইংরাজের সঙ্গীন নির্বিচারে নিরীহ জনসাধারণের বুকের রক্ত পান করে চলবে, এ তিনি কি করে সহ্য করবেন! যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে, তা নিয়েই শেষ পর্যন্ত লড়াই করে চলবেন।

লক্ষ্ণৌর প্রতিরোধ সংগ্রামে বিদ্রোহী নেতারা যে বিশৃংখলা, দুর্বলতা ও ভীরুতা দেখিয়েছে, তার জ্বালা মৌলবী এখনও মর্মে মর্মে বোধ করছেন। এ কলঙ্ক যেটুকু পারা যায় মোচন করে যেতে হবে। লক্ষ্ণৌর পতন হয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছে, ইতিহাসের পাতায় এ স্বীকৃতিটুকু তিনি রেখে যাবেন।

মৌলবী নির্বোধ নন। তিনি জানতেন, সুবর্ণ সুযোগ চলে গিয়েছে। যা গিয়েছে, তা আর ফিরবেনা। আর কোন আশা নেই। তবুও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, কারণ "যুদ্ধ করাই আমাদের কর্তব্য।"

লক্ষ্ণৌ শহরের একটা এলাকা, নাম শাহাদাৎগঞ্জ। মৌলবী আর তাঁর সহচরগণ এ জায়গায় এসে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন।

হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য শহরের উপর দিয়ে বীরদর্পে টহল দিয়ে ফিরছে, তারই মাঝখানে এ ক'টি বীর—হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, মরিয়া! মরিয়া না হলে এমন দুঃসাহস কে করতে পারে! ফিরিঙ্গী অজগর সমস্ত লক্ষ্ণৌকে গ্রাস করে ফেলেছে, সে অজগরের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে লক্ষ্ণৌকে আবার ছিনিয়ে আনতে চান!

উন্মাদ, মৌলবী উন্মাদ! উন্মাদ, কিন্তু অপূর্ব!

বৃটিশ ঐতিহাসিক ম্যালেসন সাহেব লিখছেন, "বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে সব চেয়ে নাছোরবান্দা মৌলবী আবার ফিরে এসেছেন লক্ষ্ণৌ শহরের বুকে। শহরের বুকের মাঝখানে শাহাদাৎগঞ্জ বলে যে এলাকাটি আছে, দু'দুটো কামান সাজিয়ে মৌলবী সেখানে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন। একটি সুরক্ষিত বাড়ীর মধ্যে বসে তিনি ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত। নাইনটিথার্ড হাইল্যাণ্ডার্স ও ফোর্থ পাঞ্জাব রাইফেলসকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠানো হোল এ সামান্য শক্তি নিয়ে মৌলবী সে যুদ্ধে যে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন, বিদ্রোহীদের মধ্যে তা খুব বেশী দেখা যায়নি! চারদিকে

www.pathagar.com

শত্রুদল, তার মাঝখানে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে চললেন। তারপর আমাদের পক্ষের কিছু লোককে হত্যা করে এবং বহু লোককে জখম করে তবে তাঁরা স্থান ত্যাগ করলেন।"

লক্ষ্ণৌর পতনের পর রোহিলখন্দ ও অযোধ্যায় বিদ্রোহীদের কোন শক্তিশালী কেন্দ্রই বাকী রইল না। চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে বিদ্রোহীরা এ এলাকার মধ্যেই এসে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রবল ভাবে প্রতিরোধ দিতে পারে, এমন কোন কেন্দ্র তাদের হাতে রইল না।

বিদ্রোহের নেতারা বুঝতে পারলেন পুরানো কায়দায় যুদ্ধ করতে গেলে কিছুতেই টিকে থাকা যাবে না। একমাত্র পন্থা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অনুসরণ করে চলা। তাই নেতারা সমস্ত প্রদেশব্যাপী লড়াইয়ের এক নতুন কৌশল সম্পর্কে এক ফতোয়া জারী করলেনঃ

"দুশমনকে সামনাসামনি যুঝতে চেষ্টা কোরো না। তাদের ব্যবস্থা ভালো, নিয়মানুবর্তিতা বেশী। তা ছাড়া তাদের বড় বড় কামান আছে। তাদের চলাচলের উপর লক্ষ্য রাখ। নদীর সবগুলি ঘাট পাহারা দাও, যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটাও, রসদ সংগ্রহে বাধা দাও, তাদের ডাক আটকাও, তাঁবুর আশে পাশে লেগে থাক, তারা যেন নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ না পায়।"

মৌলবী এখন থেকে গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় লড়াই চালাতে শুরু করলেন। এবার তাঁর নতুন এক রূপ দেখা গেল।

ইংরাজ সৈন্যেরা লক্ষ্ণৌতে বসে আছে। সেখান থেকে ২৯ মাইল দূরে 'বারি'তে মৌলভী তাঁর ঘাঁটি করলেন। অপরদিকে 'বিতাওলি'তে রইলেন অযোধ্যার বেগম—বেগম হজরতমহল ৬ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে।

ইংরাজ সেনাপতি দুদিকেই নজর রাখলেন, একটি একটি করে দুটিকেই খতম করতে হবে। তিনি প্রথমতঃ মৌলবীকে শায়েস্তা করবার জন্য 'বারি'র দিকে এগোলেন। মৌলবীও চোখ কান খুলে বসেছিলেন। সংবাদটা তাঁর কাছে পৌঁছতে দেরী হোল না।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহের নেতারা সবাই এসে শাহজাহানপুরে মিলিত হয়েছেন।

www.pathagar.com

খবর পেয়ে স্যার কলিন উল্লসিত হয়ে উঠলেন, এবার সব ক'টিকে একই সঙ্গে জালে ফেলা যাবে! তিনি অতি গোপনে সমস্ত শাহজাহানপুর শহরটিকে ঘেরাও করে ফেললেন। এবার দেখি কেমন করে পালায়! এতদিনের দুশ্চিন্তা এবার মিটল।

শাহজাহানপুর অধিকার করতে বিশেষ বেগ পেতে হোল না। কিন্তু হায় হায়, স্যার কলিনের কপাল চাপড়ানোই সার হোল! কোথায় গেল সব দলপতিরা! সব ক'টি পাখীই উড়ে পালিয়েছে।

শাহজাহানপুরের প্ল্যানটা ভেস্তে যাওয়ায় স্যার কলিন এবার বেরিলীর দিকে ছুটলেন। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পতনের পর বেরিলীই বিদ্রোহীদের শেষ আশ্রয়। মীর্জা ফিরোজ শাহ্, নানাসাহেব, মৌলবী আহ্মদ শাহ্, বালা সাহেব, বেগম হজরত মহল, রাজা তেজ সিং এবং অন্যান্য নেতারা সবাই রোহিলখন্দে চলে এসেছেন। রোহিলখন্দের রাজধানী বেরিলীই তখন একমাত্র স্বাধীন কেন্দ্র।

কিন্তু এবারও স্যার কলিনের মতলব হাসিল হোল না। বিদ্রোহের দলপতিরা হাওয়ার মত এবারও তার হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলেন। স্যার কলিন ফাঁকা মাঠেই যুদ্ধ জয় করলেন। দলপতিরা ধরা না পড়লেও বেরিলী অধিকার করে মনটা তার খুশীই ছিল। কিন্তু মৌলবী তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবেন না।

স্যার কলিন সবে মাত্র একটু আয়েস করে বেরিলী জয়টাকে উপভোগ করতে বসেছেন, এমন সময় শিবিরময় কোলাহল জেগে উঠল—মৌলবী! মৌলবী! আবার সে মৌলবী!

কোথায়, কোথায় মৌলবী?

আর কোথায়! দুরন্ত বাজের মত কোত্থেকে এসে ছোঁ মেরে বসেছে আবার সে শাহজাহানপুরে।

সমস্তই পূর্বপরিকল্পিত।

স্যার কলিন যখন শাহজাহানপুর অবরোধ করেছিলেন, মৌলবী যুদ্ধ এড়িয়ে গেছেন। শুধু গা বাঁচাবার জন্য নয়, তাঁর মাথায় ঘুরছিল অন্য একটা মতলব। শাহজাহানপুর ছেড়ে চলে যাবার আগে তিনি শহরের

www.pathagar.com

সমস্ত সরকারী দালানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবার আদেশ দিয়েছিলেন, শত্রুসৈন্য যাতে আশ্রয় নেবার স্থান খুঁজে না পায়। মৌলবী ও অন্যান্য দলপতিরা এটা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্যার কলিন শাহজাহানপুরে কিছু সৈন্য রেখে দিয়ে, অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে নিশ্চয়ই বেরিলী আক্রমণ করতে ছুটবেন। তারপর দেখা যাবে।

তাঁরা যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই ঘটল।

বেরিলীর ইংরাজ সৈন্যেরা যখন বিজয়োৎসবে মত্ত, হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত মৌলবী অতর্কিতে শাহজাহানপুরের ইংরাজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সরকারী বাড়ীগুলি ভেঙ্গে ফেলে দেওয়াতে ইংরাজ সৈন্যেরা খুবই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। খোলা ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হোত তাদের।

মৌলবীর এ আক্রমণ প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। শাহজাহানপুরে আবার স্বাধীনতার সবুজ নিশান উড়ল।

এ সংবাদ যখন স্যার কলিনের কানে এসে পৌঁছল, তিনি চমকে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা চিন্তা করে তিনি মনে মনে খুবই খুশী হয়ে উঠলেন। একবার যে সুযোগ তিনি পেয়েও হারিয়েছেন, মৌলবীকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাঁকে ধরতে পারেন নি, এবার মৌলবী নিজেই সে সুযোগ তার হাতে তুলে দিয়েছেন। এবার দেখা যাবে মৌলবী কোন পথ দিয়ে পালায়!

স্যার কলিন এবার প্রথম থেকেই অতি সাবধানে আটঘাট বেঁধে কাজ শুরু করলেন। সত্যসত্যই এবার কোন দিক দিয়েই কোন ফাঁক ছিল না। এ বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

শিকারী আর শিকারের মধ্যে বুদ্ধি আর শক্তির কঠিন প্রতিযোগিতা চলছে। তিন দিন পর্যন্ত দু'পক্ষে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলল।

বিদ্রোহীদের অন্যান্য দলপতিরা, যারা বাইরে ছিলেন, তাঁরা নির্বাক দর্শক হয়ে রইলেন না। কি করেই বা থাকবেন? অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ জন-প্রিয় নেতা, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে এ সংকটের মুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন। মহাবিদ্রোহের সব চেয়ে

www.pathagar.com

মূল্যবান সম্পদ মৌলবী, তাঁকে তাঁরা কোন মতেই হারাতে পারেন না। অযোধ্যার বেগম থেকে নানাসাহেব পর্যন্ত সবাই এসে হাত মিলালেন।

স্যার কলিনের দৃঢ় বেষ্টনী ভিতর ও বাইরের এ বিপুল চাপ সহ্য করতে পারল না। মৌলবী দিবারাত্রি যুদ্ধ করতে করতে সে বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা গেল না। প্রতিপক্ষ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

মৌলবীকে এবার সদলবলে বিধ্বস্ত করে দিতে পারবেন, এ বিষয়ে স্যার কলিনের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি তাঁর হিসাবের খাতা থেকে মৌলবীর নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। এ দিকটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ইতিমধ্যেই হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন যে সৈন্যেরা যেন অতঃপর দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে যায়। কিন্তু তিনি যা কিছু প্ল্যান করেন, মৌলবী তা বরবাদ করে দেন।

স্যার কলিনের পরিকল্পনাকে এভাবে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে কোথায় গেলেন মৌলবী? কোথায়, কতদূর? আবার কোন দিকে তার পিছে পিছে ছুটতে হবে? কোথায় গেলেন মৌলবী? স্যার কলিন চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন।

খবর পেতে বেশী দেরী হোল না, মৌলবী গেছেন অযোধ্যায়।

হায় হায়, আবার সে অযোধ্যায়! সারা বছরের এত কষ্ট, এত হাঙ্গামা, এত রক্তপাতের ফলে যে অযোধ্যা থেকে বিদ্রোহীদের নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, আবার সে অযোধ্যায়!

স্যার কলিন সসৈন্যে অযোধ্যায় গেলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। মৌলবী চলে এলেন রোহিলখন্দে। পিছন পিছন ধাওয়া করে স্যার কলিন চলে এলেন রোহিলখন্দে। যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। আর মৌলবী? মৌলবী আবার চলে গেছেন অযোধ্যায়।

এ কি বিষম খেলা! এ খেলার শেষ কোথায়!

এভাবে, এ নতুন কায়দায় মৌলবী ইংরাজ সৈন্যদের অতিষ্ট করে তুললেন। বিলাতের কাগজগুলিতে মৌলবীকে নিয়ে লেখালেখি চলতে লাগল।

www.pathagar.com

এ বীর বিদ্রোহীর মাথার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়ে গেল।

মৌলবী অযোধ্যায় ফিরে এসে নতুন শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন। পাওয়েনের রাজাকে যদি পক্ষে টেনে আনা যায়, তা হলে অযোধ্যার বুকে আবার বিদ্রোহের ঝড় তুলে দেওয়া যাবে।

মৌলবী পাওয়েনের রাজার কাছে অযোধ্যার বেগমের নামে একটি অনুরোধলিপি পাঠালেন। রাজা তার উত্তরে জানালেন, তিনি মৌলবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করতে চান। মৌলবী বিশ্বস্ত চিত্তে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কাছে যেতেই তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাইরের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, প্রাচীরের উপর সশস্ত্র প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, আর তাদের মাঝখানে বসে আছেন রাজা জগন্নাথ সিংহ ও তার ভাই। এর অর্থ পরিষ্কার। তবু মৌলবী ভয় পেলেন না, হাল ছাড়লেন না। নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় রাজাকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা। রাজা যেমন কাপুরুষ, তেমনি বিশ্বাসঘাতক।

মৌলবী বেশী কথা বলবার সময় পেলেন না। আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল। রাজার ভাই প্রাচীরের উপর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ল।

মৌলবী মাটিতে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না।

বীর দেশপ্রেমিকের বুকের রক্তে মাটি পবিত্র হোল।

হায় রে, আমার দেশ! এ দেশে মীরজাফর আর উমিচাঁদের অভাব কোনদিনই হয় না।

পরদিন সুসভ্য ইংরাজ বিজয়চিহ্ন স্বরূপ মৌলবীর মাথা কোতোয়ালীর উপরে ঝুলিয়ে রাখল। আর পাওয়েনের সেই লোভী জানোয়ারটাকে তার এ বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হোল।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছলে পরে সেখানকার লোকেরা হাঁফ

www.pathagar.com

ছেড়ে বাঁচল। ঐতিহাসিক হোমস সাহেব লিখছেন যে ইংরাজেরা এ বলে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল যে উত্তর ভারতে তাদের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শত্রুর এতদিনে পতন ঘটল।

মৌলবী সম্পর্কে ঐতিহাসিক ম্যালেসন সাহেব লিখেছেন ঃ

"মৌলবী একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। বিদ্রোহের সময় সামরিক নেতা হিসাবে তাঁর যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে স্যার কলিনের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনাই হয় না। স্যার কলিনকে লড়াইয়ের ময়দানে দু'দুবার নাস্তানাবুদ করতে পেরেছেন, এ অহঙ্কার করবার মত দ্বিতীয় লোক জন্মায়নি।—এভাবেই ফৈজাবাদের মৌলবীর মৃত্যু ঘটল। যে লোক স্বদেশের হৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, তাঁর নাম যদি দেশপ্রেমিক হয়, তা হলে মৌলবী একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ নেই। তিনি যুদ্ধের বাইরে হত্যার কাজে তাঁর তরবারীকে কখনোই কলংকিত করেন নি, কোন হত্যাকে প্রশ্রয় দেন নি। যে বিদেশীরা তাঁর দেশ কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি বীরের মত সসম্মানে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশেই থাকুন না কেন, যাঁরা সত্যিকারের বীর, যাঁদের সত্যিকারের প্রাণ আছে, মৌলবীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁদের শির নোয়াতেই হবে।"

বৃটিশ ঐতিহাসিক যাঁকে সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র বলে বর্ণনা করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি, তাঁর দেশের মানুষ তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবে?

আমরা আজ তাঁর কথা ভুলে গিয়েছি, আমরা আজ তাঁকে চিনি না।

এত বড় একটা চরিত্র যে এভাবে অজ্ঞানতা ও অবহেলার আড়ালে চাপা পড়ে গেল, এ কেবল আমাদের মত দেশেই সম্ভব।

আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা তাদের পাঠ্য কেতাবে দেশী বিদেশী কত লোকের জীবনীই তো পড়ে, কিন্তু মৌলবী আহমদ শাহের জীবন নিয়ে একটি কথাও কি কোথাও থাকে! আমাদের দেশের তরুণেরা সভায়, মিছিলে কত লোকের নামেই তো জয়ধ্বনি করে, কিন্তু প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের নাম তাদের জানা নেই।

www.pathagar.com

ভারতের জনৈক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তাই সেদিন বড় দুঃখের সঙ্গেই বলেছেন, "বর্তমানে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের বীর শহীদদের স্মরণে যে সব আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে বা অনুষ্ঠিত হবে, তার মধ্যে মৌলবী আহমদ শাহের নাম কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে পারে নি।"

ভারতের ক্ষেত্রে তিনি যে কথা বলেছেন, আমাদের পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও সে কথা কি তার চেয়ে এতটুকুও কম সত্য ?

বিচিত্র আমাদের দেশ, আর বিচিত্র আমরা !

www.pathagar.com

বদলা চাই

কানপুর শহর আবার ইংরাজদের দখলে এসে গিয়েছে। মাঝখানকার দিন কয়টা যেন একটা স্বপ্ন। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত ইংরাজ সৈন্যেরা শহরে এসে ঢুকল। তাদের চোখে বন্য পশুর হিংস্র চাহনী। এবার শুরু হবে প্রতিহিংসা নেবার পালা।

হতভাগ্য কানপুর, কত না বীভৎস দৃশ্য তাকে চোখ মেলে দেখতে হয়েছে! বিদ্রোহী সিপাইরা সাহেবদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। স্ত্রীলোক আর শিশু, তাদেরও রেহাই দেয় নি।

শতগুণ রক্তপাত করে সে রক্তপাতের জবাব দিতে হবে। ক্ষিপ্ত ইংরাজ সৈন্যেরা আর তাদের নেতা জেনারেল নীল হিংস্র গর্জন করে উঠলেন—বদলা চাই! প্রতিহিংসা নেবার এক বীভৎস পরিকল্পনা খাড়া করলেন। বিবিঘরের মাটি তখনও ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুদের রক্তে কলঙ্কিত হয়ে ছিল। নির্দেশ দেওয়া হোল, যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হবে, তাদের জিভ দিয়ে চেটে সে রক্ত পরিষ্কার করে দিতে হবে। তারপর ফাঁসী।

সফর আলী—সেকেণ্ড রেজিমেণ্ট লাইট ইনফ্যানট্রির দফাদার। তাকেও বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে। কে এক জন নাকি বলেছে যে গত ২৭শে জুন তারিখে সতীচওড়াঘাটের হত্যাকাণ্ডের সময় এ লোকটি নাকি জেনারেল হুইলারকে হত্যা করেছিল।

সফর আলী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "না হুজুর, একথা ঠিক নয়। একথা যেই বলে থাক, মিছে বলেছে। হুইলার সাহেবের মারা যাবার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

জেনারেল নীল তার কথা বিশ্বাস করলেন না। কে দোষী, কে নির্দোষ, অত বিচার করে দেখবার মত সময় তখন কোথায়! তখন প্রয়োজন ফাঁসীতে ঝুলাবার মত কতগুলি লোক।

www.pathagar.com

সফর আলীকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসা হোল, বিবিঘরের মেঝের উপর যে রক্ত জমে আছে, চেটে সাফ করে দিতে হবে।

"চেটে ফেল, চেটে ফেল ওই রক্ত তোর জিভ দিয়ে।"

সফর আলী ভয়ার্তভাবে চারিদিকে তাকাল, মিনতি জানিয়ে বলল, "হুজুর, আমি নির্দোষ, আমার উপর এমন হুকুম করবেন না।"

শপাৎ করে চাবুক নেমে এল। চাবুকের পর চাবুক—আরও, আরও—

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল সফর আলী, ঝর ঝর করে পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। মেজর ক্রুসের মেথর পুলিশ চাবুকের পর চাবুক মেরে চলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না—

হ্যাঁ, জেনারেল নীলের আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে। ওই দেখ সফর উপুড় হয়ে কুকুরে মত রক্ত চেটে চলেছে। ইংরাজ সৈন্যেরা হো হো করে হেসে উঠল।

কানপুরের মানুষ আতংকে ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে সে দৃশ্য দেখল। সামনেই ফাঁসিকাঠ সাজানো ছিল। তার নীচে সফর আলীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোল। মাত্র আর কয়েকটি মুহূর্ত তার সম্বল।

দেখতে দেখতে সফর আলীর চেহারা বদলে গেল। ভয় নেই, আতংক নেই, বিস্ফারিত চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভীক, বেপরোয়া সফর আলী ভয় করতে ভুলে গেল। যে সব লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে এ নৃশংস হত্যালীলা দেখছিল, তাদের উদ্দেশ্য করে সফর আলী চীৎকার করে উঠল ঃ "ভাই সব, শোন, তোমাদের কাছে আমার এ শেষ কথা। তোমাদের মধ্যে যারা ভাল মানুষ, যাদের বিবেক আছে, ইমান আছে, তাদের কাছে আমার এ কথাগুলি পেশ করে যাচ্ছি। তোমাদের বাপ মা আছে, ভাই বোন আছে, স্ত্রী আছে, বেটা-বেটী আছে, তোমরা জানো, তাদের মায়া মহব্বতের কথা। আজ আমাকে বিনা দোষে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফাঁসীর দড়ীতে লটকে দেওয়া হচ্ছে।

'ভাই সব, তোমরা শুনে রাখো, কোন কসুরই আমি করি নি। তোমাদের মতই আমি নির্দোষ। আমার কোন কথাই শোনা হোল না, বিচার করে

www.pathagar.com

দেখা হোল না, ওদের মনের আক্রোশ মিটাবার জন্যই আমাকে আজ প্রাণ দিতে হচ্ছে।

'মরে গেলেও একথা আমি ভুলতে পারব না। মরে গেলেও এ জ্বালায় আমি দগ্ধ হতে থাকব, তিলেকের জন্য শান্তি পাব না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ হারামী সাহেবের উপর কেউ এর বদলা না নেয়।

'ভাই সব, মরবার আগে আমার আর কোন আকাংক্ষা নেই, আর কোন সাধ নেই, প্রতিশোধ, একমাত্র প্রতিশোধ, মরবার আগে এ আমার একমাত্র চিন্তা। আর কোন কথা আমি ভাবতে পারছি না। কিন্তু আমার হয়ে কে নেবে এ প্রতিশোধ, কে আমার এ রুহের জ্বালা মিটাবে।

'ভাই সব, শোনো, রোটকে আমার ঘর। আমার এক বাচ্চা ছেলে আছে, নাম তার মজর আলী। এসব কথা বুঝবার বয়স তার হয় নি। কিন্তু একদিন হবে। সে দিন আমার কোন কথাই তো সে জানতে পারবে না। মরবার আগে তোমাদের কাছে এ কাজের ভারটুকু দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা সেদিন আমার এ খবরটুকু তার কাছে পৌঁছে দিও। বোলো, এ হারামীরা, এ শয়তান ফিরিঙ্গীরা তার আব্বাজানকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছিল, মরবার আগে সকলের সামনে মেথর দিয়ে চাবুক মারিয়েছিল। আর বোলো, আমাকে ফাঁসীতে ঝুলবার আগে মাটি থেকে রক্ত চেটে তুলতে হয়েছে। আমি জানি শুনে সে দুঃখ পাবে, পাক্, তবু তাকে সব কথা খুলেই বোলো, এতটুকু গোপন কোরো না। বাপের কাজ আমি কিছুই করে যেতে পারলাম না, কিন্তু তাকে বোলো ছেলের কাজ সে যেন করে। তাকে বোলো তার আব্বাজান ফাঁসির দড়ীতে ঝুলবার আগে তার শেষ আদেশ রেখে গেছে—এর বদলা নিতে হবে, আমার জানের বদলে সে হারামীর নয়তো তার ছেলে বা বংশধরের জান নিতেই হবে। যতক্ষণ এ কাজ হাসিল না হয়, ততক্ষণ আমার রুহ কিছুতেই শান্তি পাবে না।

"অ্যায় খোদা, অ্যায় রসুল, আমার বেটার হাতে এ তাকৎটুকু সেদিন দিও যাতে সে তার এ পবিত্র দায় পূর্ণ করতে পারে।"

এর পরেই সফর আলীর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল!

www.pathagar.com

সাহেবেরা এ কথা নিয়ে হাসাহাসি করল। মানুষ ক্ষেপে গেলে কত কিছুই না বলে!

ত্রিশ বছর পরের কথা। ১৮৮৭ সাল। সফর আলীর ছেলে মজর আলী মেজর নীলের অধীনে কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছে।

মেজরের ভারী পেয়ারের লোক। তার উপরে তিনি খুবই খুশী। কাজের গুণে মজর আলী সব সময়েই তার কাছ থেকে অনুগ্রহ পেয়ে আসছে। বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল তার। সুখে শান্তিতে সংসারধর্ম প্রতিপালন করে চলছিল। কিন্তু নীল আকাশের পিছনেও বজ্র লুকিয়ে থাকে।

সেদিন মজর আলী অসুস্থ হয়ে সামরিক হাসপাতালে শয্যা নিয়েছিল। তেমন বড় কিছু রোগ নয়, শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে। সন্ধ্যা হয় হয়, কোথা থেকে এক বৃদ্ধ ফকীর এসে হাজির। মজর আলীর খোঁজ করতে করতে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ফকীরকে দেখেই মজর আলী চমকে উঠল। ওকে দেখলেই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। পরনে ঢিলে আলখাল্লা, মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষু চুলগুলি উড়ছে, চোখের কোণে কিসের একটা ক্রুর সংকেত। মজর আলী জোয়ান সওয়ার, সাহসী বলেই পরিচিত। তবু এই আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আবছায়ায় একটু নুয়ে পড়া সেই দীর্ঘ দেহটির দিকে তাকিয়ে মজর আলীর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

ফকীর কোনই ভূমিকা করল না। দেরী করবার সময় তার নেই, কাজটুকু শেষ করেই চলে যাবে। মজর আলীর পাশে বসে, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে সে ফিস ফিস করে বলে চলল: "বেটা শোন্, এ মেজর নীল সে জেনারেল নীলেরই ছেলে, যার হুকুমে তোর আব্বাজানকে বিনা দোষে ফাঁসীর দড়ীতে ঝুলতে হয়েছিল, যার হুকুমে তাঁকে কুকুরের মত মাটি থেকে রক্ত চেটে নিতে হয়েছিল। এর বদলা চাই—মরবার আগে তোর বাপ তোর জন্য এ আদেশ রেখে গেছে। এ না হলে তাঁর রুহের শান্তি হবে না। ত্রিশ বছর ধরে এ খবরটা আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এ খবরটা তোর হাতে পৌঁছে দেবার জন্য বহুদূর থেকে আমাকে

www.pathagar.com

ছুটে আসতে হয়েছে। আঃ খোদাহ্, এবার আমি খালাস। এবার আমি দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারব।"

একটু ইতস্ততঃ করে মজর আলী বলল, "সাহেব লোক কিন্তু খুবই ভাল। সবাই তাঁকে খুব পছন্দ করে।"

ফকীর চাপা কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, "কেউটের বাচ্চা কেউটে, ওদের আবার ভাল আর মন্দ! ওদের কারু দাঁতেই বিষ কম নেই। দেখ বেটা, মরদ যদি হোস, বাপের বেটা বলে যদি দাবী করতে চাস্, তবে আর দেরী নয়, কাজ হাসিল কর। আর তা যদি না পারিস, জাহান্নামে যা।"

ফকীর ঝড়ের মতই এসেছিলেন, ঝড়ের মতই মিলিয়ে গেলেন।

বাইরে তখন মেঘ গর্জন করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, শোঁ শোঁ করে ঝড় আসছে—ঝড়!

সওয়ার মজর আলী স্থির, শান্ত ভাবে তার বিছানায় শুয়ে রইল, একটু নড়ল না, একটু কাঁপল না। কে জানে, কি ভাবছিল সে মনে মনে!

পরদিন ভোরবেলা রোজকার মতই বিউগল বেজে উঠল। সিপাইরা দলে দলে ময়দানে প্যারেড করতে এসেছে। ঘোড়ার উপর বসে মেজর নীল অর্ডার দিচ্ছেন, যেমন রোজ দিয়ে থাকেন। হঠাৎ একটা গুলীর আওয়াজ শোনা গেল। সবাই চমকে উঠল, চেয়ে দেখল মেজর নীলের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। হত্যাকারী কাছেই ছিল। ধরা পড়ল। সওয়ার মজর আলী।

১৮৮৭ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে মজর আলীর ফাঁসী হয়ে গেল।

কেন, কিসের জন্য এ হত্যাকাণ্ড! লোকে এ নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। দু'একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ইঙ্গিত করলেন, এর পিছনে স্ত্রীঘটিত ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কিন্তু রহস্যই থেকে গেল। সরকারী তরফ থেকেও এর কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না।

কিন্তু মজর আলীর মৃত্যুর পর একটা ইশ্‌তাহার উত্তর ভারতের বাজারে বাজারে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ইশ্‌তাহারটি উর্দু ও

www.pathagar.com

ইংরাজী ভাষায় পরিষ্কার টাইপে ছাপানো। এর উপরের অংশ ছিল রসুলের কাছে মজর আলীর বাপ সফর আলীর শেষ প্রার্থনা। আর নীচের অংশে মজর আলীর ফাঁসির সংবাদ বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। কারা যে ইশ্‌তাহারটা ছড়াচ্ছিল, সে কথা কেউ বলতে পারে না। ইশ্‌তাহারে লেখা ছিল।

"হে মহম্মদ রসুল! মেজর ব্রুসের মেথর পুলিশ তোমার এ দীন বান্দাহ্‌র দেহকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে, জেনারেল নীলের হুকুমে তাকে দিয়ে বিবিঘরের রক্তাক্ত মেঝে চাটিয়ে পরিষ্কার করানো হয়েছে, তারপর তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তোমার এ দীন বান্দাহ্‌র রুহ্‌কে তোমার কাছে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাও। হে রসুল, যখন সময় হবে, তখন আমার ছেলে মজর আলীর বুকে এ প্রেরণা জাগিয়ে দিও যেন জেনারেল নীল বা তার বংশধরদের উপর সে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে।

"দ্রষ্টব্য—সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া হর্সের সেকেণ্ড রেজিমেণ্টের সওয়ার মজর আলী ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৮৭ সালের ১৪ই মার্চ মধ্যভারতের অন্তর্গত 'আগার'এ মেজর এ, এইচ, এস্‌, নীলকে গুলী করে হত্যা করেছে। গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট স্যার লেপেল গ্রিফিন-এর আদেশে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।"

জানিনা, সফর আলীর রুহ্‌ এতে শান্তি পেয়েছিল কিনা।

www.pathagar.com

পতিতা আজিজন

আর দু'দিন বাদে ?

হ্যাঁ, আজিজন, আর দু'দিন বাদে।

তুমি বল কি শামসুদ্দিন, আর দু'দিন বাদেই আমরা—

হ্যাঁ, দু'দিন বাদেই আমরা ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করব।

সব ঠিক ?

হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

কাল সন্ধ্যায়। গঙ্গার উপরে। মুসলমানেরা পাক কোর্‌আন ছুঁয়ে আর হিন্দুরা গঙ্গার পানি ছুঁয়ে কসম করেছে, জান দিতে তারা কসুর করবে না।

কে কে ছিলেন সেখানে ?

আর আমাকে প্রশ্ন কোরোনা আজিজন, আর বেশী জানতে চেয়োনা। অনেক কথাই বলে ফেলেছি, যা আমার কোন মতেই বলা উচিত ছিল না।

কেন বললে ?

কি জানি কেন, কি যেন যাদু জান তুমি, তোমার কাছে না বলে যে পারি না। সুখের খবর যদি কিছু থাকে, তোমার কাছে না বলা পর্যন্ত মনটা ভরে ওঠে না।

আচ্ছা শামসুদ্দিন, একটা কথা। যা তুমি বলছ, তাই যদি হয়, সত্যসত্যই যদি আমরা স্বাধীন হতে পারি, তাতে আমাদের লাভটা কি হবে বলতে পার ?

তুমি বল কি আজিজন, লাভ হবে না ? দেশের মানুষ খেয়ে পরে সুখে থাকবে, সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে, সবাই নির্বিঘ্নে যে যার ধর্মকর্ম করতে পারবে, আর কি চাই ?

আর একটা কথাও বলতে পারতে, বললে না তো ? সওয়ার শামসুদ্দিনের

www.pathagar.com

পদোন্নতি হবে, তার অনুগৃহীতা আজিজনের দু এক খানা গয়না বাড়বে।

তুমি কি আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করছ আজিজন ?

না শামসুদ্দিন, বিদ্রূপ নয়। অনেক দুঃখে এসব কথা বেরিয়ে আসে। জানি, স্বাধীন দেশে তোমরা স্বাধীন মানুষের মর্যাদা পাবে। কিন্তু সে শুভদিনে পতিতা তো পতিতাই থাকবে, পতিতাকে কি আর মানুষ বলে মনে করবে কেউ ?

কেন পতিতা কি মানুষ নয় ? আজিজন, তুমি কি জাননা আমরা, ২ নং ক্যাভেলরির সওয়াররা কি চোখে তোমাকে দেখি ?

না শামসুদ্দিন, না, তুমি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিতে চেষ্টা কোরো না। আমি কি জানি না, আমি কি ? তোমরা আমাকে ভালবাসতে পার, আদর করতে পার, কিন্তু মর্যাদা দিতে পার না। কিন্তু কি করব আমি, আমার এ জীবনের জন্য আমিই কি দায়ী !

আজ এ আনন্দের দিনে অমন দুঃখের সুর টেনে আন কেন আজিজন ?

তুমি তো জান না শামসুদ্দিন, আনন্দের দিনেই আমার দুঃখ যেন শত গুণ হয়ে দেখা দেয়। একথা তুমি বুঝবে না, কেউ বুঝবে না, যার বোঝার সেই শুধু বোঝে। পতিতা পতিতাই, সেকথা অস্বীকার করব কি করে ! কিন্তু তা হলেও আমি একথা অনুভব করতে পারি যে, পতিতাও মানুষ।

এ কথা আমি স্বীকার করি।

না, তা কর না ; করতে পার না। মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে ভুলাতে চেয়োনা। আমিও যে মানুষ, সেকথা আমিই শুধু জানি, আর কেউ জানে না। একদিন একথা আমি প্রমাণ করে দেখাব। হ্যাঁ, আমি সকলের কাছে প্রমাণ করে দেখাব।

প্রমাণ ? কি করে প্রমাণ করবে ?

যেদিন তোমরা ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, সেদিন তোমরা আমাকে তোমাদের পাশেই পাবে। যদি প্রয়োজন হয়, বুকের রক্ত দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিয়ে যাব। সেদিন তোমরা আমাকে

www.pathagar.com

নর্তকী বলে নয়, সুন্দরী বলে নয়, প্রেমের পাত্রী বলে নয়, মানুষ বলেই চিনবে। মানুষ বলেই মর্যাদা দেবে। বিশ্বাস হয়?

হয়। আমি জানি তোমার অসাধ্য কিছুই নেই।

আজিজন সেদিন এতটুকু মিছে বলেনি। যা বলেছিল, কাজেও তাই দেখাল। যখন সময় এসে ডাক দিল, সাড়া দিতে এতটুকু দেরী সে করে নি। কানপুরের মানুষ সেদিন তাদের সুপরিচিতা পতিতা আজিজনকে এক নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখল।

বিদ্রোহের ডামাডোলের মাঝখানেও এটা কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। পুরুষের পোষাকে নর্তকী আজিজন ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বিদ্রোহীদের পাশে পাশে। তার কোমরে ঝুলছে তরোয়াল, হাতে পিস্তল। কানপুরের সে ভয়ংকর দিনগুলিতে অচল নিষ্ঠার সঙ্গে সে তার কর্তব্য করে চলেছে। গোলন্দাজ বাহিনীর ফৌজেরা ক্লান্তিতে, তৃষ্ণায় ধুঁকছে। পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজিজন। ক্লান্ত সৈনিক তার হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে, উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। পানি নিয়ে, দুধ নিয়ে, খাবার নিয়ে, ঘুরে ঘুরে ফিরছে আজিজন। তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত সিপাইদের মধ্যে বিতরণ করে চলেছে।

এ কাজের জন্য কেউ তাকে ডাক দেয় নি। আপনার জায়গা সে আপনিই তৈরী করে নিয়েছে।

নানকচাঁদের মত ইংরাজদের একান্ত অনুগত দালাল, এ দৃশ্য তাকেও মুগ্ধ করেছিল। বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি তার কুখ্যাত ডাইরীতে তীব্র বিষ ঢেলে দিয়েছেন, তার চোখে বিদ্রোহীরা পাজী, বদমাস ও শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার সে নানক চাঁদই ২।৩ টি ছত্রের মধ্য দিয়ে আজিজনের যে উজ্জ্বল ছবিটি এঁকে তুলেছেন, তা ভুলবার মত নয়ঃ

"পতিতা অজিজন অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। বীর সজ্জায় সুসজ্জিত আজিজন, তার হাতের অস্ত্র কখনোই নামে না। যেখানে যুদ্ধের তীব্রতা সব চেয়ে বেশী, সে ব্যাটারীর কাছেই তাকে সব সময় উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায়। সওয়ারদের মধ্যে যারা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তাদের সে ডেকে নিয়ে আসে, প্রকাশ্যে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে দুধ বিতরণ করে।"

www.pathagar.com

আজিজন নগণ্য বেশ্যা। ইতিহাস তাকে ধরে রাখে নি। ঐতিহাসিক তার জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করেন নি। কিন্তু সে রক্ত-ঝরা ভয়াল বিদ্রোহের দিনে আজিজন আপনাকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল যে তাকে একেবারে হারিয়ে ফেলবার উপায় নেই। অতীতের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের মত ঝিলিক মেরে পরক্ষণেই আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে বৃটিশ তদন্ত কমিটির কাছে কানপুরের বনিক জানকী প্রসাদের জবানবন্দীতে আর একবার আজিজনের উল্লেখ পাই। তিনি তাঁর জবানবন্দীতে বলছেন ঃ

"কুল্লুমল্-এর রক্ষিতা আজিজন, হ্যাঁ, চিনি বই কি তাকে! সে লাড়কি মহলের উমরাও বেগমের বাড়ীতে থাকত। ২নং ক্যাভেলরির সওয়ারদের সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল, সওয়ারদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। যেদিন সবুজ নিশান তোলা হয়েছিল, সেদিন দেখেছিলাম তাকে, পুরুষের বেশে ঘোড়ার উপর বসে আছে। তার গলায় পদকের মালা ঝুলছে, দুহাতে দুই পিস্তল। সেদিন সে জেহাদীদের দলে যোগ দিয়েছিল। সেদিন তাকে দেখেছিলাম। শুধু আমি নই, হাজার হাজার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ ছিল।"

আজিজনকে শেষবারকার মত দেখি তার নিজের জবানবন্দীর সময়। বিদ্রোহ শেষ হবার বছর দুই বাদে যে তদন্ত কমিটি বসেছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার বিদ্রোহে যোগদানের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেল। স্বীকার করবেই বা কেন?

শুধু নিজেকেই নয়, যাদের উপর বিপদ আসবার আশংকা ছিল, এ জবানবন্দীর মধ্য দিয়ে সে তাদের সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। নানাসাহেব ও আজিমুল্লাহ ধরা পড়েননি, আর পড়লেও তাঁদের চরম দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে তাঁদের উপরেই সমস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

আজিজনের জবানবন্দীর যে অংশটুকু পাওয়া গেছে, তা এখানে উপস্থিত করা হোল ঃ

www.pathagar.com

প্রশ্ন—বিদ্রোহের আগে ২নং ক্যাভেলরির কোন কোন সওয়ার তোমার কাছে যাওয়া আসা করত ?

উত্তর—আমি তখন কুল্লুমলের রক্ষিতা ছিলাম, কাজেই ২নং ক্যাভেলরির কোন সওয়ারই আমার কাছে আসতে পারত না।

প্রঃ—বিদ্রোহের দিন দুই আগে সওয়ার সামসুদ্দিন কি তোমার বাসায় গিয়ে বলেছিল যে ২।১ দিনের মধ্যেই পেশোয়ার শাসন আবার কায়েম হবে এবং নানাই হবেন তার সর্বাধিনায়ক ?

উঃ—বিদ্রোহের আগে সওয়ার শামসুদ্দিন খাঁ আমার বাসায় কোন দিন আসেন নি। তাঁকে আমি চিনি না। যদি এসে থাকেন, আমার জ্ঞাতসারে নয়।

প্রঃ—কানপুরে যে ধর্মীয় নিশান তোলা হয়েছিল, সে সম্পর্কে তুমি কি জান ?

উঃ—শুনেছি আজিমুল্লাহ্ খাঁ এ নিশান তুলেছিলেন। মৌলবী আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আপত্তিতে কোনই কাজ হয়নি।

আজিমুল্লাহ্ শহরবাসীদের এ উৎসবে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন, যারা না আসবে, তাদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

স্বাধীনতার সংগ্রামের দীপ্ত আভায় পতিতা আজিজন জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তারপর ? কোথায় গেল আজিজন ? যে তিমিরে, সে তিমিরে ? কে বলবে সে কথা ! হঠাৎ জ্বলে ওঠা এ উল্কা ভস্ম হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে !

www.pathagar.com

সভ্যতার অবদান

অযোধ্যার কবি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করেছিলেন ; আর ইলিয়াড রচনা করেছিলেন গ্রীসের কবি হোমার। লঙ্কার কবি ও ট্রয়ের কবির উপর যদি কাব্য রচনার ভার পড়ত, তাহলে সে কাব্যের রূপ কেমন হোত কল্পনা করা সহজ নয়।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের ইতিহাস পড়তে পড়তে সে কথাই মনে পড়ে। এ ইতিহাস সম্বন্ধে যাই ধারণা করি না কেন, সব কিছুর উপর বৃটিশ ঐতিহাসিকের চিন্তা এসে প্রভাব বিস্তার করবেই। এ সম্বন্ধে যতই সজাগ থাকবার জন্য চেষ্টা করিনা কেন, এ প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার কোনই উপায় নেই।

বৃটিশ ঐতিহাসিক সিপাইদের নিষ্ঠুর নারীহত্যা ও শিশুহত্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয়েছে। অতিরঞ্জিত হলেও, এর কিছুটা সত্য, একথা অস্বীকার করা যায় না। এগুলি অবশ্যই নিন্দনীয়। বিদ্রোহের পক্ষে এতে লাভ হয় নি, ক্ষতিই হয়েছে।

কিন্তু অপর দিকটা ?

"আঠারোশো সাতান্নের বিদ্রোহের" লেখক অশোক মেহ্‌তা লিখেছেন ঃ

"বৃটিশের কুকীর্তি আমাদের আচরণকে ম্লান করে দিয়েছে, অথচ তাদের মিথ্যা প্রচারকার্য আমাদের অপরাধকেই জোর তুলিতে অংকিত করেছে, তাদের নিজেদের অপকার্য আছে চাপা।"

তাদের নিজেদের বহু অপকার্যই চাপা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু বৃটিশ ঐতিহাসিকদের নিজেদের লেখার মধ্যেও মাঝে মাঝে যে দুটো একটা খবর দেওয়া হয়েছে, যে দু একটু মন্তব্য করা হয়েছে, তা পড়লে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বাইরের মানুষের কথা দূরে থাক, আমাদের দেশের মানুষেরাও সে খবর রাখে না।

সুসভ্য ইংরাজের কীর্তি কাহিনীর কয়েকটি চিত্র ঃ

www.pathagar.com

দিল্লী

বাদশাহের সঙ্গে ছিলেন চারজন শাহ্‌জাদা—মীর্জা মোগল, মীর্জা আবুবকর, মীর্জা খিজির সুলতান এবং মীর্জা মেদ্দ। দুর্গ থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই ইংরাজ সৈন্যেরা তাঁদের ঘিরে ধরল। বাদশাহ্‌কে পাল্‌কীতে করে নিয়ে যাওয়া হোল। শাহজাদারা চললেন গরুর গাড়ীতে। ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের যেখানে হত্যা করা হয়েছিল, সে দেওয়ান-ই-আম্‌-এর সামনে গিয়ে পৌঁছলে পরই শাহজাদাদের গুলী করে মারা হোল। শহরের লাহোর গেট থেকে কাশ্মীর গেট পর্যন্ত সমস্ত এলাকা লুণ্ঠিত হয়ে গেল। মীর্জা বুখতওর শাহ পরে ধরা পড়লেন। তাঁকেও হত্যা করা হোল। বাদশাহের দেহরক্ষকদের নায়ক শাহ্‌ সামাদ খাঁ কাশ্মীর গেট দিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। জুজ্জুরের রাজার সৈন্যদের সেনাপতি বলে সনাক্ত করা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গুলী করে হত্যা করা হোল।

শহরে কারো জীবনই নিরাপদ ছিল না। যে সব সমর্থ পুরুষকে পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে বিদ্রোহী বলে গুলী করে মারা হয়েছে। দাদরার রাজার ভাইপো মহম্মদ আলী নিরাপত্তার জন্য দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কয়েকজন গুর্খা ও গোরা সৈন্য লুটপাট করছিল, তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করল। দরজা ভাঙ্গতে না পেরে তারা দেয়াল বেয়ে উপরে উঠল। একজন ধাত্রী ওদের দেখে এতই ভয় পেল যে, সে তার শিশুটিকে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাড়ীর অন্যান্য মহিলারা আতংকগ্রস্ত হয়ে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সে কুয়োতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করল।

মহম্মদ আলী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন্দুক চালালেন। তাঁর গুলিতে তিন জন গোরা সৈন্য মারা গেল। তখন বড় একদল সৈন্য এসে সে বাড়ীটা আক্রমণ করল এবং বাড়ীর সব ক'টি লোককে হত্যা করল। মহম্মদ আলী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন।

অস্ত্রশস্ত্র সহ ষাট জন লোককে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হোল। এদের মধ্যে মহামেডান কলেজের অধ্যাপক শেখ ইমাম বক্‌স ও তাঁর ছেলেরা ছিলেন। যারা যারা মারা গেলেন তাঁদের মধ্যে

www.pathagar.com

সুপরিচিত হেকিম ফল্লাউল্লাহ খাঁও ছিলেন। বাদ বাকী যারা, তাঁরাও কেউ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

মৌলবী ফরিদউদ্দীন সকাল বেলার নামায সেরে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। তখন ইংরাজ সৈন্যেরা শহরে ঢুকে পড়েছে। পথে তাদের সঙ্গে দেখা। তাদের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। হাকিম আহমদ হোসেন ও হাকিম রাজিউদ্দীন খাঁ একই ভাবে পথের উপর মারা গেলেন। মীর্জা ইউসুফ খাঁর অনেক দিন ধরেই মস্তিস্ক বিকৃতি চলছিল। বন্দুকের শব্দ পেয়ে ব্যাপার কি দেখবার জন্য পথে বের হয়েছিলেন, তাঁকেও হত্যা করা হয়। এছাড়াও শহরের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে বিদ্রোহী সন্দেহ করে হত্যা করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবাব মুজফ্‌ফরুদ্দৌলাহ্‌, মহম্মদ হোসেন খাঁ, মীর্জা আহমদ খাঁ, মীর মহম্মদ হোসেন খাঁ, আকবর খাঁ, মীর খাঁ, নৌশির খাঁ, হামিদ আবদুল হক, খলিফা ইসমাইল, মহম্মদ খাঁ, রিসালদার সফদর বেগ খাঁ ও আসবুজু ইয়ার খাঁ। এ ছাড়া বাদশাহের পরিবারের শাহজাদারা তো আছেনই। তরুণ বৃদ্ধ সবাকেই হত্যা করা হয়েছে, দোষী-নির্দোষী সকলেরই একই পরিণতি ঘটেছে। যারা কোন-রকমে তরোয়ালের মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী ছিল।

যতদিন পর্যন্ত স্যার জন লরেন্স শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আদালত খুলে না বসলেন, ততদিন কত লোক যে মারা গেল তার হিসেব নেই। তারপর শুরু হোল অপরাধীদের বিচার। যার সঙ্গে যার শত্রুতা ছিল, সেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে চলল। নির্দোষ ও অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যার প্রতিহিংসা যে এভাবে নেওয়া হবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

[ন্যারেটিভ অব মৈনুদ্দিন]

সমস্ত বিদ্রোহীরাই দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমাদের সৈন্যেরা ছাড়া অতি অল্প লোককেই নগরে দেখা যেত। যখন আমাদের সৈন্যেরা নগরে প্রবেশ করে, তখন যে সকল লোককে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের সকলকেই সঙ্গিনের ঘায়ে বধ করা হয়েছিল। কোন কোন ঘরে চল্লিশ-পঞ্চাশ

www.pathagar.com

জন পর্যন্ত লোক লুকিয়ে ছিল। এতেই আপনি বুঝতে পারেন নিহত লোকের সংখ্যা কত বেশী। এরা বিদ্রোহী নয়, নগরের অধিবাসী। এদের মনে মনে আশা ছিল যে এদের ক্ষমা করা হবে। আমি সানন্দে জানাচ্ছি যে এদের এ বিষয়ে হতাশ হতে হয়েছিল।

[মার্টিন রচিত 'ইণ্ডিয়ান এমপায়ার']

দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে যারা বাস করছিল, তারা সকলেই এখন ইংরাজ পক্ষের সৈন্যদের শত্রু ; সুতরাং তারা বধ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।

[লর্ড রবার্টস রচিত 'ফরটিওয়ান ইয়ারস্ ইন ইণ্ডিয়া']

বিদ্রোহীরা প্রায় এক শত আহত ও রুগ্ন সিপাইকে নিজেদের শিবিরে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ক্যাপটেন হডসনের সৈন্যেরা এ নিঃসহায় জীবদের সকলকেই হত্যা করে। কয়েক জন আহত সিপাই দরবার গৃহের বারান্দায় শুয়েছিল। ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গিনের আঘাতে এদেরও মৃত্যু হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার লিখেছিলেন ঃ "তরোয়ালের আঘাতে একজন সিপাইর দু'হাত কাটা গিয়েছিল, শরীরে বন্দুকের গুলী বিঁধেছিল, পেটের দু জায়গায় সঙ্গিনের আঘাত লেগেছিল। লোকটি তখনও বেঁচে ছিল। একজন ইংরাজ সৈনিক এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, নিঃসহায় ও নিরবলম্বন লোককেও রেহাই দিল না। তার বন্দুকের গুলীতে এর মাথার ঘিলু বেরিয়ে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে যে কি ঘৃণা ও লজ্জার উদ্রেক হয়েছিল, তা বলবার নয়।"

[মার্টিন রচিত 'ইণ্ডিয়ান এমপায়ার']

দোষী আর নির্দোষী সবাই একই সঙ্গে মরতে লাগল। ইংরাজ সৈন্যেরা যাকে রাস্তায় দেখতে পেল তাকেই গুলী করে মেরে চলল। শহরে এমন ক'জন লোকও ছিলেন, যাদের তুল্য মানুষ কখনও জন্মায় নি, জন্মাবেও না। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উৎকৃষ্ট লেখক মিঞা মহম্মদ আমীন পন্‌জকুশ, মৌলবী ইমাম বক্‌স সব্‌ভই ও তাঁর দুই ছেলে, মীর নিয়াজ আলী প্রভৃতি। এঁদের এবং কুচাছেলানের অধিবাসীদের (শোনা যায় তারা সংখ্যায় ছিল চৌদ্দশো) রাজঘাট গেটে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের গুলী করে হত্যা করে। মৃতদেহগুলি যমুনার পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হোল। ঘরের

www.pathagar.com

মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সন্তানদের নিয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিল। কুচাছেলানের সবগুলি কুয়ো মৃতদেহে ভর্তি হয়ে গেল। আমার কলম আর বেশী লিখতে সাহস করছে না।

[জহির দেহ্লভী রচিত 'দস্তন-ই-গদর']

কবি গালিবের লেখায় সেদিনকার দিল্লীর করুণ অবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন ঃ

"শহর হো গৈ সাহারা। শহর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উর্দু বাজার গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে, উর্দুভাষা আর বলবে কে? দিল্লী আর সে মহানগরী নেই, তার দুর্গ, তার শহর, তার দোকান পাট, তার ফোয়ারা সব কিছুই গেছে। হিন্দু মহাজনেরা আছে, কিন্তু ধনী মুসলমান আর নেই বললেই চলে।"

"সম্মুখে আমার রক্তের মহাসমুদ্র, খোদাই শুধু জানেন আমাকে আরও কত কি দেখতে হবে! আমার হাজার হাজার বন্ধু আজ মৃত্যুশয্যায় লীন। আমি কার কথা স্মরণ করব, কার কাছে আমার প্রাণের ব্যথা জানাব! আমার জন্য চোখের পানি ফেলবে, এমন একটি প্রাণীও আজ জীবিত নেই।"

"দিল্লীর কোতল-এ-আম-এ (পাইকারী হত্যাকাণ্ড) হাকিম রেজাউদ্দীনকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। আহমদ হোসেন ও তাঁর ছোট ভাইকেও হত্যা করা হোল ঐ দিনই। তালিয়ার খানের দুই ছেলে তংক থেকে এসেছিল, বিদ্রোহ দেখা দেওয়াতে তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। তাদের গুলী করে মারা হয়েছে আজ।"

কবি গালিবের চোখে ঘুম নেই। এ অন্ধকারের মধ্যে তিনি বিভ্রান্ত, দিশাহারা। সে আবেদন তাঁর কবিতায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

কোই উম্মীদ বাড় নাহি আতি,
কোই সুরৎ নজর নাহি আতি,
মৌত্কা একদিন মোয়াইন হ্যায়,
নিদ কিউ রাতভর নাহি আতি।

www.pathagar.com

কোনখানে নেই আশার লেশ, কোনখানে নেই সুন্দরের আভাস,
মরণের দিন স্থির হয়েছে,—সারারাত কেন কারো চোখে নামেনি ঘুম।
[গালিব রচিত 'দস্তমবু']

বারানসী

বারানসীর সিপাইদের অভ্যুত্থানের পর জেনারেল নীল নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে "শান্তি শৃংখলা রক্ষা করবার জন্য" ইংরাজ ও শিখ সৈন্যদের নিয়ে কয়েকটি "শান্তি বাহিনী" গঠন করলেন। এ শান্তি বাহিনীগুলি শান্তি রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে ফিরত। যাকে দেখতে পেত, হয় কেটে ফেলত, নয়তো তার ফাঁসির ব্যবস্থা করত। ফাঁসির প্রার্থীদের সংখ্যা দিন দিন এতই বেড়ে যেতে লাগল যে, একটা ফাঁসিকাষ্ঠ দিয়ে আর কুলানো যাচ্ছিল না, যদিও সারাদিনের মধ্যে তার কাজের কামাই ছিল না। তাই কাজের সুবিধার জন্য এক লাইন ধরে অনেকগুলি ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করানো হোল। কিন্তু অত্যধিক কাজের চাপে সবাইকে পুরোপুরি মেরে ফেলা সম্ভব হোত না, অনেককে আধমরা অবস্থাতেই ফেলে দিতে হোত।

ইংরাজরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল, ক্রমাগত গাছ কেটে কেটে ফাঁসিকাষ্ঠে তৈরী করার কোনই মানে হয় না। তখন তারা গাছগুলিকেই ফাঁসিকাষ্ঠ পরিণত করল। গাছের ডালে ডালে দড়ী বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে লাগল। দিনের পর দিন এ "সামরিক কর্তব্য" ও "খৃষ্টান-দায়িত্ব" প্রতিপালনের গতি হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল। এ গুরুতর প্রয়োজনীয় দায়িত্ব প্রতিপালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে যখন একঘেয়ে বলে মনে হোত, তখন বৈচিত্র্য ও আমোদ পরিবেশনের জন্য নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে হোত। মনে করুন, যাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, হাতীর পিঠে বসিয়ে দেওয়া হোল। হাতীটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। গাছের ডাল থেকে যে দড়ীর ফাঁসটা ঝুলছে, সেটা গলায় এঁটে দিয়ে হাতীটাকে হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা কৌতুকের দিক রয়েছে। শিল্পীজনোচিত রুচিবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

প্রাচ্যের অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলবার জন্য যারা সভ্যতার মশাল নিয়ে বেরিয়েছিল, তাদের দায়িত্ব বড় কঠিন। কিন্তু যতই কঠিন হোক না কেন, এই দায়িত্ব পূর্ণ করতে তারা কখনোই পিছিয়ে পড়েনি।

কালো কুৎসিৎ লম্বিত দেহের একঘেয়ে ছবি দেখতে দেখতে চোখের ক্লান্তি জাগে। তাই তারা মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করত। "এ একঘেয়েমিকে ভাঙ্গবার জন্য তারা সোজাসুজি না ঝুলিয়ে দেহগুলিকে ভেঙ্গে চুরে বিকৃত করে, কোনটাকে ইংরাজী অঙ্ক চার-এর মত, কোনটাকে বা সাত-এর মত করে নিয়ে তারপর ঝোলাত।"

[কে এণ্ড ম্যালেসন রচিত 'হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি']

অবশেষে নতুন একটা কৌশল খুঁজে পাওয়া গেল। এ পন্থাটা এমন চমৎকার ও সহজ যে, এর পর থেকে ফাঁসি দেওয়ার রীতিটা তুলে দিয়ে এ নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যেই কাজ চলতে লাগল। এক দিক থেকে গ্রামের পর গ্রাম মাটির সঙ্গে সমান করে দেওয়া হতে লাগল। গ্রামের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চারদিক ঘেরাও করে বন্দুক নিয়ে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও, হাজার হাজার মানুষ পুড়ে মরতে কতক্ষণ বা সময় লাগে! এতে শিকারের আনন্দ পাওয়া যায়, তা ছাড়া ব্যাপারটা কৌতুকপ্রদও বটে।

ইংরাজদের কাছে এ জিনিসটা এতই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠির মধ্যে এ মজাদার কাহিনীগুলিকে বেশ রসিয়ে রসিয়ে লিখত। এমন নৈপুণ্য ও দ্রুততার সঙ্গে আগুন লাগানো হোত যে, গ্রামবাসীরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ পেত না।

"হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মৌলবী, স্কুলের ছাত্র, শিশুকে বুকে নিয়ে মা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অন্ধ-খোঁড়া সবাই এ অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে মরত। চলৎশক্তিহীন স্থবির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আগুন দেখেও এক পা সরতে পারত না, জ্বলন্ত বিছানায় ছটফট করে মরত।"

[চার্লস বল রচিত 'ইণ্ডিয়ান মিউটিনি']

www.pathagar.com

কোন লোক যদি এ অগ্নি-বেষ্টনী ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারত, তাতেই বা কি! একজন ইংরাজ সৈন্য তার চিঠিতে লিখছে ঃ

"আমরা জনপূর্ণ বড় একটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে চারদিক ঘেরাও করে রইলাম। আগুনের মুখ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেকেই ছুটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গেই গুলী চালালাম।"

[চার্লস বল রচিত 'ইণ্ডিয়ান মিউটিনি']

একি শুধু দুটো চারটে গ্রামের কথা! গ্রামগুলিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করবার জন্য এ উদ্দেশ্যে সংগঠিত বিভিন্ন দলকে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। তারই একটি দলের একজন অফিসার তাঁর চিঠিতে লিখছেন, "শুনে খুশী হবে, আমরা কুড়িটি গ্রামকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছি।"

এ সমস্ত ঘটনা নিয়ে কোন ঐতিহাসিক বিস্তারিত ভাবে কিছু লেখেন নি। কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, এসব তার থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন লিখেছেন, "জেনারেল নীলের প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে কোন কথা না লেখাই ভাল।"

বারানসীতে বিদ্রোহীদের দ্রুত শাস্তি বিধানের জন্য মিলিটারী কোর্ট বসানো হয়েছিল। মিলিটারী কমিশনারেরা ছোট বড় সমস্ত অপরাধীকেই ফাঁসীর হুকুম দিয়ে চলতেন।

একদিন বিচারে কয়েকটি বালকের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হোল। ওদের অপরাধ এই যে বড়দের দেখাদেখি ওরা, খেলার সাথীরা মিলে সবুজ নিশান উড়িয়ে, ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় মিছিল বের করেছিল। ছেলেমানুষ, আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে যে কি বিপদ ঘটতে পারে, সেকথা ওদের জানা ছিল না। বিচারকদের মধ্যে একজন অফিসার একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন, ছেলেগুলির কচি মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে পানি এসে গেলে। কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছে গিয়ে তিনি মিনতি জানালেন—"এরা নিতান্তই ছেলেমানুষ, বয়সের কথা বিবেচনা করে, দয়া করে এদের শাস্তি কমিয়ে দিলে ভাল হয়।"

www.pathagar.com

কম্যাণ্ডিং অফিসার দুর্বলচিত্ত লোক নন, কোন রকম দুর্বলতার প্রশ্রয় তিনি দেন না! তিনি দয়া দেখাতে রাজী হলেন না। অবিচলিত কণ্ঠে বললেন ঃ এ সকল বিষয়ে বয়সের হিসাব করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইউরোপে আমরা যাদের বালক বলি, এদেশে তারা বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা। এ বয়সে তাদের বিয়ে হয়, পুত্রকন্যা জন্মে, যৌবনের সমস্ত শক্তি প্রবল থাকে, তারা তাদের স্বাধীনতা ও সমস্ত কাজের দায়িত্ব বুঝতে পারে।"

এলাহাবাদ

একজন বৃটিশ অফিসার তাদের এলাহাবাদের সাফল্য সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে কিছুটা তুলে দেওয়া হোল ঃ

"আমাদের এবারকার যাত্রা অদ্ভুত রকম উপভোগ্য হয়েছে। আমরা নদীপথে ষ্টীমারে চলেছি, আর শিখ ও ফুসিলিয়ার বাহিনীর সৈন্যেরা হেঁটে শহরের দিকে চলেছে। আমাদের সঙ্গে একটা কামান। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে কামান দাগতে দাগতে আমরা এগিয়ে চলেছি। কতদূর যাবার পর ষ্টীমার আর চলল না। আমরা নেমে হেঁটে চললাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার পুরানো দোনলা বন্দুকটা। তাই দিয়ে বেশ কয়েকটা নিগারকে ধরাশায়ী করলাম। প্রতিহিংসায় আমি তখন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। আমরা যে পথ দিয়ে যাই, দুদিকে আগুন লাগিয়ে যাই। অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করে, আর বাতাসের বেগে হু হু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিনে বিশ্বাসঘাতক শয়তানগুলোর প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে। আমরা প্রতিদিন এ অভিযানে বের হই, বিক্ষুব্ধ গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেই। আমরা আমাদের প্রতিহিংসা পূরণ করে চলেছি। নেটিভদের বিচারের জন্য যে কমিশন বসানো হয়েছে, আমাকে তার নেতা হিসাবে মনোনীত করেছে। এদের সবার পরমায়ু আমাদের হাতেই ঝুলছে। একথা তুমি স্থির ভাবে জেনে নিও, আমরা কাউকে রেহাই দেই না।"

www.pathagar.com

মেজর রেনোঁর প্রতি জেনারেল নীলের নির্দেশ ঃ

"যে পথ ধরে চলবে, তার দুধারে যতগুলি শত্রু-অধিকৃত গ্রাম আছে সবগুলোকে ধ্বংস করে চলবে। অন্য জায়গায় হাত দেবার দরকার নেই। যে গ্রামগুলোকে ধ্বংস করবে বলে স্থির করবে, সেখানকার অধিবাসীদের সবাইকে হত্যা করবে, কাউকে রেহাই দেবে না। ফতেপুর শহর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। শহরের পাঠান বস্তি আক্রমণ করে সমস্ত অধিবাসীদের হত্যা করতে হবে, বস্তিটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। ফতেপুরের ডেপুটি কলেক্টরকে যদি ধরতে পার, তবে তার ফাঁসি দেবে, আর তার মাথাটা কেটে নিয়ে শহরের প্রধান অট্টালিকার উপর বিদ্ধ করে রাখবে।"

উপরওয়ালার এ নির্দেশ মেজর রেনোঁ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়ম রাসেল তাঁর 'ডায়েরী অব ইণ্ডিয়া'তে লিখেছেন ঃ "মেজর রেনোঁর সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসারের সঙ্গে আজ আলাপ হোল। তিনি বলছিলেন, 'নেটিভদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা একেবারে চরম সীমায় উঠে গিয়েছিলাম। দুদিনের মধ্যে পথের ধারে বিয়াল্লিশ জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আমরা পথ দিয়ে কুচকাওয়াজ করে চলেছি, তখন আমাদের দেখে বারো জন লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, শুধু এ কারণেই সে বারো জন লোককে ফাঁসিতে ঝুলতে হোল।' মেজর রেনোঁ যেখানে থামতেন, তার সম্মুখের সমস্ত গ্রামগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হোত। কানপুরে নানাসাহেবের নির্দেশে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার অজুহাত দেখিয়ে রেনোঁর এ দুষ্কর্মের সাফাই গাইবার কোনই উপায় নেই, কারণ কানপুরের ঘটনা ঘটেছিল এরও পরে।"

জেনারেল নীল ও মেজর রেনোঁর এ বীভৎস অত্যাচারের ফলে গ্রামাঞ্চলের কি দুর্গতি হয়েছিল, কানপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট জন ওয়ালটার শেরেরের বর্ণনার মধ্যে আমরা তারই একটু আভাস পাই। হ্যাভলকের সৈন্যদলের সঙ্গে তিনি যখন কানপুরের দিকে যাত্রা করলেন, তখন এ বিধ্বস্ত গ্রামগুলির মধ্য দিয়েই তাকে যেতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

"পথের দুধারে গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যে গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে চলেছি, তার চেয়ে শূন্যতার ছবি আর কল্পনা করা যায় না। পথের দুধারে পচা জলাভূমি পুড়ে যাওয়া কুঁড়েগুলির কালো কালো ধ্বংসাবশেষ, তার উপর ছাতা পড়েছে। মানুষের অস্তিত্বের পরিচায়ক এতটুকু শব্দও শোনা যায় না। শব্দের মধ্যে শুধু ব্যাঙের ডাক, শেয়ালের তীক্ষ্ণ চীৎকার, আর অদৃশ্য সহস্র সহস্র পতঙ্গের একটানা মৃদুগুঞ্জন। নিমফুলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডালে গলিত মৃতদেহগুলি ঝুলছে, শুয়োরগুলি তাই নিয়ে মহোৎসবে মেতে গেছে, তারই উৎকট দুর্গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে। এ সমস্ত কিছু মিলে আমাদের মধ্যে যে শূণ্যতা, কালিমা ও বেদনার ছবি রচনা করে তুলেছে আমার মনে হয় যারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল তারা জীবনে কোনদিন তা ভুলতে পারবে না।"

মুসলমানদের শুয়োরের চামড়া দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে সেলাই করা হোত, তারপর ফেলে দেওয়া হোত নদীতে; কিংবা শুয়োরের চর্বিতে ভিজিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়া হোত এবং মৃতদেহ আগুনে দগ্ধ করা হতো। হিন্দুদের ফাঁসি দেওয়ার আগে গোমাংস মুখে পুরে দেওয়া হোত। ফতেগড়ের দেওয়ানকে হত্যা করার আগে তার মুখে জোর করে গোমাংস পুরে দেওয়া হয়েছিল।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের মিঞামীরের বিদ্রোহী সিপাইরা দুজন অফিসারকে হত্যা করে। নেটিভের এমন স্পর্ধা! এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে চিরদিন মনে থাকে। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপার নিজের কীর্তিকাহিনী নিজের মুখেই প্রকাশ করেছেন ঃ

"একশো পঞ্চাশ জনকে হত্যা করার পর ঘাতকদের মধ্যে একজন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তাকে খানিকটা বিশ্রাম করতে দিলাম। তারপর আবার নিধন-পর্ব শুরু হোল। নিহতের সংখ্য যখন দুশো ছত্রিশ-এ এসে দাঁড়িয়েছে, তখন

www.pathagar.com

খবর পাওয়া গেল, বাকী যে সব বন্দীদের প্রাণদণ্ড দেবার অপেক্ষায় আটক রাখা হয়েছিল, তারা কেউ বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় না। দরজা খুলে দেখা গেল হলওয়েলের অন্ধকুপ হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পঁয়তাল্লিশটি মৃতদেহ কুঠরীর ভিতর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসা হোল। লোকগুলি ভয়ে ক্লান্তিতে পরিশ্রমে গরমে ও আংশিক ভাবে শ্বাসকষ্টে আপনা হতেই মরে গেছে।"

[ফ্রেডারিক কুপার রচিত 'দি ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব']

ঝাঁসী

ঝাঁসীর পতনের পর সমস্ত নগরে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চলতে লাগল। ঘটনার নায়ক হিউরোজ নিজেই সে সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এ একটি কথাতেই বোঝা যায় যে, একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। নগরীর আশে পাশের বন বাগান রাস্তা বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপূর্ণ হোল।"

প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার লো বলেছেন ঃ

"মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্কাগতিতে। একটি মানুষকেও ছেড়ে দেওয়া হোল না। রাস্তাগুলিতে রক্তস্রোত বইতে শুরু করল।"

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতে ঝাঁসী অধিকার করবার পর ঝাঁসীতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রমাণাদি দেখে মনে হয় সংখ্যাটা খুবই কম করে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

নেটিভদের শিক্ষা দেওয়া দরকার

জেনারেল নীলের কাছ থেকে আমরা একটি বিবৃতি পেয়েছি। বিবৃতিটি তুলে ধরবার মত। নেটিভদের কি করে শিক্ষা দিতে হয় এ বিবৃতিতে তারই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে ঃ "আমি এদেশের লোকদের একবার আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে চাই। যে দণ্ড আমি তাদের দেব, তা হবে চরমতম দণ্ড ; যা তাদের অনুভূতিকে উৎক্ষিপ্ত করে তুলবে, যা তারা কোনদিন ভুলতে পারবেনা। হ্যাঁ, এমনি দণ্ডই আমি তাদের দেব। এ জন্য আমি নিম্নোক্ত আদেশ জারী করেছি। ক্ষমাপ্রবণ শান্তস্বভাব বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের কাছে হয়তো এ আদেশ খুবই আপত্তিজনক বলে মনে হবে, তবু আমি মনে করি, বর্তমান সংকটের অবস্থায় এ দণ্ডই তাদের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী।

"যে সকল দুর্বৃত্ত বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল, তাদের দিয়ে নির্দোষীদের রক্তে রঞ্জিত বিবিঘরের মেঝেকে সাফ করিয়ে নিতে হবে। অপরাধীর প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হলে পরে তাকে একজন প্রহরীর সঙ্গে বিবিঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে মেঝের একটা অংশ সাফ করাতে হবে। এ কাজটা যাতে তার কাছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক বলে মনে হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কেউ যদি এ কাজ করতে আপত্তি করে, তবে চাবুক মেরে তাকে শায়েস্তা করতে হবে। রক্ত মোছার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেই তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে হবে। এ উদ্দেশ্যে হাতের কাছেই একটি ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করে রাখতে হবে।"

"প্রথম যাকে নিয়ে আসা হোল সে হচ্ছে ৬নং নেটিভ ইনফ্যানট্রির একজন সুবাদার। একটা মোটা জানোয়ার, জাতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাকে এ কাজ করতে বলায় সে আপত্তি জানাল। সঙ্গে সঙ্গেই শপাশপ নেমে এল চাবুক। জানোয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল। শেষ পর্যন্ত সাফ তাকে করতেই হোল, না করে যাবে কোথায়! কাজ শেষ হবার

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। তার পর তার লাশটাকে পুঁতে ফেলা হোল সদর রাস্তার উপর।"

"আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসা হোল। তার মধ্যে এক ব্যাটা মুসলমান। সিভিল কোর্টের একজন অফিসার। সে ব্যাটা বিষম পাজী, দলের একজন পাণ্ডাগোছের লোক।"

"হুকুম দেওয়া হোল, নে ব্যাটা উপুড় হ, মাথা নোওয়া, জিভ দিয়ে চেটে তোল এ রক্তের দাগ। উঁহুঃ শুনবে না কথা। সিধে আঙ্গুলে ঘী উঠবে কেন! শেষকালে চাবুকের এমনি গুণ, জিভ দিয়ে চেটে কুল পায় না।"

"অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমার এ আদেশটা একটু উদ্ভটই বটে। কিন্তু যেমন কুকুর তেমনি মুগুর চাই তো! এটাই হচ্ছে ওদের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী। ভগবানের আদেশ ও সহায়তায় আমি আমার এ কর্তব্য করে যাব। আমার এ কাজের পিছনে তাঁর পবিত্র অঙ্গুলীর নির্দেশ রয়েছে, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

হা ভগবান, জেনারেল নীল তা'হলে তোমার আশীর্বাদ ও সাহায্য নিয়েই তাঁর এ পবিত্র দায়িত্ব প্রতিপালন করে চলেছিলেন! হা ভগবান, তুমি কাদের ভগবান? সাম্রাজ্যবাদীরা কি তোমাকে শুদ্ধু কিনে নিয়েছে?

কর্ণেল জন নিকলসন কিন্তু এতেও তুষ্ট নন। কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়াই বল, আর ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়াই বল, যে ভাবেই হত্যা করা হোক না কেন, এ মরণ তো সহজ মরণ। এতে শুধু মারাই চলে, শিক্ষা দেওয়া যায়না। এতে আর কতটুকু কষ্ট দেওয়া চলে, কতটুকু প্রতিহিংসা মেটানো চলে! তিনি দাবী করে বসলেন, নতুন একটা বিশেষ আইন পাশ করা চাই, যার সাহায্যে মৃত্যুকে আরও বেশী কঠোর করে তোলা যাবে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা।

কর্ণেল এডওয়ার্ডিসের কাছে তিনি এসম্পর্কে লিখছেন ঃ

"আসুন, আমরা এমন একটা বিল উত্থাপন করি, যাতে দিল্লীর এ সমস্ত নারীঘাতক ও শিশুঘাতকদের জন্য 'জীবন্ত চামড়া তুলে ফেলা,' 'জীবন্ত পুড়িয়ে মারা' প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারবে। দুষ্কর্মকারীদের কেবলমাত্র

www.pathagar.com

ফাঁসি দিয়ে মারবার কথা চিন্তা করলে আমার মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আঃ, আমি যদি আপনাদের ওখানে থাকতাম! প্রয়োজন বুঝলে আইন আমি আমার নিজের হাতেই তুলে নিতাম।"

কিছুদিন পরে তাঁর এ মহৎ প্রস্তাবের কোনই সাড়া না পেয়ে তিনি তাঁর সে পরিকল্পিত বিলটিকে উপস্থিত করবার জন্য আরও জোরের সঙ্গে চাপ দিতে লাগলেন।

"আমাদের মেয়েদের হত্যা ও ধর্ষণ করেছে যারা, সে সমস্ত দুর্বৃত্তদের নতুন ধরণের মৃত্যুর ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে আমি যে বিলটিকে আনবার জন্য প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলাম, কই, আপনি তার উত্তরে কিছুই লিখলেন না তো! যদি আপনারা কেউ এ বিষয়ে সাহায্য না করেন, আমি নিজেই এ প্রস্তাব তুলব। এ শয়তানগুলো কেবলমাত্র ফাঁসিতে ঝুলেই রেহাই পেয়ে যাবে, এ আমি কোনমতেই সহ্য করতে পারব না।"

এর পর আর এক চিঠিতে তিনি লিখলেন ঃ

"আমাদের বাইবেলে আছে, অপরাধের মাত্রা বুঝে সে হিসাবে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিতে হবে। এ সমস্ত হতভাগাদের জন্য ফাঁসিই যদি যথেষ্ট শাস্তি বলে গণ্য হয়, তা'হলে সাধারণ বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেওয়াটা কি অতিরিক্ত কঠিন সাজা হয়ে যাবে না? তারা যদি আমার হাতে থাকত, আর আমি যদি জানতাম যে কালই আমাকে মরতে হবে, তা হলেও আমি ওদের যতদূর সম্ভব কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে মারতাম। এজন্য আমার বিবেকে এতটুকুও বাধত না। আমাদের আইনে বিভিন্ন ধরণের চুরি, মারপিট, জালিয়াতী ও অন্যান্য অপরাধের জন্য বিভিন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। খুনের বেলায়ই বা তা হবেনা কেন? বিভিন্ন ধরণের খুনের জন্য বিভিন্ন ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে না কেন?"

পবিত্র হৃদয় ও গভীর বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত জনৈক খৃষ্টান ভদ্রলোক বারাণসীর কমিশনার মিঃ টাকারকে উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"আপনার হৃদয়ের সহজাত কোমলতা সম্পর্কে আমার মনে একটু ভয় আছে। মনে রাখবেন, ইন্দ্রিয়প্রবণতার মতই এ স্নেহপ্রবণতাকেও আমাদের হত্যা করতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট বৃথাই তাঁর তরবারী ধারণ করেন না।

www.pathagar.com

ভগবানের আদেশবাণী মানুষকে এ অধিকার কখনোই দেয়নি যে সে তার আধুনিক মনের কোমলতার বশীভূত হয়ে হত্যাকারীকে পর্যন্ত রেহাই দেবে। আপনার হৃদয়কে দৃঢ় ও স্থিরসংকল্প করে তুলুন, যাতে আপনি কঠিন চিত্তে চরম দণ্ড দিতে পারেন। আইন অনুসারে কাজ করে চলুন এবং ক্ষমাপ্রবণতার বিরুদ্ধে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়ান।

"আজ সমস্ত প্রাচ্য জগতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে আতংক ও সম্ভ্রমের প্রতিষ্ঠা করে তুলবার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র তাহলেই এরা এর হিতকারিতা বুঝতে পারবে। এ সমস্ত ষড়যন্ত্র, হিংসামূলক কার্যকলাপ ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করে চলতে হবে এবং এ কঠোরতার ঐতিহ্য ভবিষ্যতের জন্য রেখে যেতে হবে। তা না হলে এ রকমের বিপদ ফিরে ফিরেই দেখা দেবে।"

www.pathagar.com

পাটনার বিদ্রোহ

বিদ্রোহের জোয়ারে সারা পাটনা টলমল করে উঠল।

জমিন আগে থেকেই তৈরী ছিল। ওহাবী আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র পাটনা। বৃটিশ বিরোধী মনোভাব অনেকদিন আগে থেকেই সেখানে দানা বেঁধে উঠেছিল। কোম্পানীর রাজত্বকে খতম করবার জন্য ১৮৫২ সালে এখানে প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়।

নাগরিকদের উপর এই গুপ্ত সমিতির বিরাট প্রভাব ছিল। সমস্ত শ্রেণীর লোকেরাই, এমন কি ধনী ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের মালিক, জমিদার—এরাও এ সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে টাকা পয়সার জন্য তাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হোত না। শহরের বিশিষ্ট মৌলবীরা এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন।

পুলিশদের মধ্যে অনেকে এদের সঙ্গে ছিল। কাজেই রাত্রিবেলা গোপন সভার কাজ চালাতে বিশেষ বেগ পেতে হোত না।

সারা দেশ জুড়ে সিপাইদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সেই ঢেউ দানাপুরেও এসে লাগল। গুপ্ত সমিতির সঙ্গে দানাপুরের সিপাইদের দহরম মহরম চলল।

কমিশনার মিঃ টেইলার বিশেষ চিন্তিত। মীরাট থেকে ভীষণ দুঃসংবাদ এসেছে, সিপাইরা নাকি বিদ্রোহ করেছে। শুধু কি মীরাট, দুদিন বাদেই দিল্লীর খবর এসে পৌঁছল। খবর তো শুধু টেইলার সাহেবের কাছেই আসেনি! চারদিকে চলেছে কানাকানি, ইংরাজদের রাজত্বের পরমায়ু নাকি শেষ হয়ে এসেছে। ১৮৫৭! পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পরে!

দানাপুরের সিপাইদের অবস্থা নাকি মোটেও সুবিধার নয়, বিষম ছটফট শুরু করে দিয়েছে, খবর এলো টেইলার সাহেবের কাছে। দানাপুরের সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হ'লে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। টেইলার

www.pathagar.com

সাহেব কি আর এই বিষয়ে কম চেষ্টা করেছেন! কিন্তু গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এ কথায় একেবারেই কান পাততে চান না। যত গোলমাল বেধেছে এ নিয়ে।

তাই বলে কি আর এমন সময় চুপ করে বসে থাকা যায়! এ সময় নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার মানে নিঃশব্দে মৃত্যু বরণ করে নেওয়া। কিছু একটা করতেই হবে। মিঃ টেইলার পাটনাকে রক্ষা করবার জন্য মিঃ র‍্যাটরের নেতৃত্বে দুশো শিখ সৈন্য আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। রাজভক্ত শিখ সিপাই। ইংরাজরা এদের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারত।

এই দুশো প্রভুভক্ত শিখ সিপাই যে পথ দিয়ে গিয়েছে লোকে তাদের দেখে ধিক্কার দিয়েছে ঘৃণায় থুথু ফেলেছে। সমস্ত মানুষের অভিসম্পাতের বোঝা মাথায় নিয়ে তারা পাটনা শহরে এসে ঢুকল।

পাটনার স্বাধীনতাকামী নাগরিকেরা তাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল: ছি, ছি, গোলামের দল, নিজের ভাইদের খুন করতে এসেছে!

অন্যের কথা বলব কি স্বয়ং শিখ ধর্মমন্দিরের পুরোহিত এদের দেখে মন্দিরের কপাট বন্ধ করে দিলেন। না—মন্দিরে দেশদ্রোহীদের প্রবেশ নিষেধ।

যেই মাত্র তারা শহরে এসে পা দিল সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে উন্মাদের মত এক ফকীর ছুটে এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। ক্রোধে ঘৃণায় তার চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের মত। "বেইমান, বিশ্বাসঘাতক!" ভীষণ মুখভঙ্গি করে সে তাদের দিকে তর্জনী তুলে কটুক্তি আর অভিশাপ দিতে লাগল।

শিখ সৈন্যেরা পাটনায় এসে পৌঁছুলে মিঃ টেইলার এবার আসল কাজে হাত লাগালেন। বিদ্রোহের চেষ্টাকে অঙ্কুরেই শেষ করে দেবেন যাতে তারা আর কখনও মাথা তুলতে না পারে।

ত্রিহুত জেলার পুলিশের জমাদার ওয়ারিস আলী সম্পর্কে সন্দেহজনক সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। তার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে গ্রেফতার করা হোল। ওয়ারিস আলী তখন গয়ার বিদ্রোহী নেতা আলী করিমের

www.pathagar.com

কাছে চিঠি লিখছিলেন। সে অবস্থায় চিঠিশুদ্ধ তিনি ধরা পড়লেন। তাঁর বাড়ীতে তল্লাস করে আরও অনেক কাগজপত্র পাওয়া গেল।

ওয়ারিস আলীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোল।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন: "যদি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক এখানে কেউ থাকো, আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাও।" তাঁর চীৎকার কারো কানে গিয়ে পৌঁছবার আগেই তাঁর মৃতদেহ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে লাগল।

আলী করিমকে গ্রেফতার করবার জন্য গয়ায় একদল গোরা সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হোল। দলের নেতা লুইস কাছে গিয়ে পৌঁছতেই আলী করিম লাফ দিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বসে হাতী নিয়ে সোজা দিলেন ছুট। পিছনে পিছনে তাড়া করে চললেন লুইস। দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলল। কে কাকে হারাতে পারে!

এ দৃশ্য দেখবার জন্য রাস্তায় লোক জমে গেল। রাস্তার মানুষ মজা দেখে কেউ হাততালি দিতে লাগল কেউ বা ফিরিঙ্গীদের লক্ষ্য করে টিটকারী দিতে শুরু করল। পথের লোক তাকে উত্যক্ত করে তুলল, পথ জিজ্ঞাসা করলে ভুল পথ দেখিয়ে তাকে নাকাল করতে লাগল। কেউ কেউ বা আরও একটু উদ্যোগী হয়ে পিছন থেকে কয়েকটা খচ্চর চুরী করে নিয়ে পালাল।

ক্লান্তিতে হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে লুইস সাহেব খালি হাতেই ফিরে এলেন।

সমস্ত বিহার জুড়ে একটানা গ্রেফতায় চলল।

কিন্তু টেইলার সাহেব জানতেন সবচেয়ে বিপজ্জনক পাটনা শহরের গুপ্ত সমিতিটি। এটিকে খতম করাই হোল আপাততঃ প্রথম কাজ।

এ গুপ্ত সমিতি বহু দিন ধরেই গোপনে গোপনে কাজ করে চলেছিল। রাত্রিবেলা এদের গোপন সভা বসত। সত্য কথা বলতে কি এদের সম্পর্কে টেইলার সাহেব খুব কমই জানতেন। কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত আছে এদের কর্মসূচিই বা কি এ সম্পর্কে তাঁর কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না তবে শহরের তিন জন বিশিষ্ট মৌলবী সম্পর্কে তাঁর মনে খুবই সন্দেহ ছিল।

www.pathagar.com

এ তিনজন মৌলবীর নাম শাহ মাহমুদ হোসেন, আহমদ উল্লাহ্ ও ওয়াজউল হক। পাটনার মুসলমান সমাজে এ দের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। হঠাৎ এঁদের বাড়ী চড়াও করে গ্রেফতার করলে সেটা শহরের অধিবাসীদের উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠতে পারে এ আশংকায় টেইলার সাহেব এঁদের ধরবার জন্য সোজা পথে না গিয়ে একটু বাঁকা পথ ধরলেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে পাঠালেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপরোক্ত তিন জন মৌলবীও ছিলেন। যথাসময়ে সবাই এসে উপস্থিত হলেন। সাময়িক অবস্থা নিয়ে সকলের সঙ্গেই কিছু কিছু আলাপ হোল। কিন্তু এ তো লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। আলাপ আলোচনার পর একে একে সবাই বিদায় নিয়ে যার যার ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সে তিনজন মৌলবীকে আর ফিরে যেতে দেওয়া হোল না।

মিঃ টেইলার তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে সাধারণের মঙ্গলের জন্য এ গোলযোগ যতদিন শান্ত না হয় ততদিন তাঁদের আটক থাকতে হবে। মৌলবীরা যদি জানতে চাইতেন কোন অপরাধে তাঁদের আটক করা হচ্ছে, তাহ'লে মিঃ টেইলারের সেদিন উত্তর দেবার মত কিছুই ছিল না। কিন্তু মৌলবীরা জানতেন এ প্রশ্ন তুলে কোনই লাভ নেই, প্রবলের শাসন যুক্তির সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না। কাজেই তাঁরা কোন বাদ প্রতিবাদ না করেই এ আদেশ মেনে নিলেন।

শিখ সৈন্যদের দিয়ে ঘেরাও করে তাঁদের যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। যাবার আগে টেইলার সাহেব আহম্মদ উল্লাহকে একটু হুশিয়ারী দিয়ে দিলেন। মৌলবী আহমদ উল্লাহর পিতা মৌলবী ইলাহি বক্স তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ বলে তাঁকে আটক করা হয় নি। মিঃ টেইলার তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মৌলবী আহমদ উল্লাকে বলে দিলেন, "মনে রাখবেন, আমি তাঁকে আটক করলাম না। কিন্তু তাঁর জীবন আপনার হাতে এবং আপনার জীবন তাঁর হাতে রয়েছে।" মিঃ টেইলারের এ উক্তির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

www.pathagar.com

মিঃ টেইলারের এ কাজের মধ্যে অনেকেই বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়েছিলেন। মিঃ টেইলার নিজেও তাঁর এ কৃতিত্বের জন্য গর্ববোধ করেছেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক কে সাহেবের মতটা একটু উল্লেখ করছি। তিনি বলছেন: "সম্ভ্রান্ত লোকদের বন্ধুভাবে নিমন্ত্রণ করে যিনি এরূপ ব্যবহার করতে পারেন, তাঁকে বিশ্বাসঘাতকের তুল্য না বলে প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক বলাই বেশী সঙ্গত। যদি মৌলবীরা কোনরূপ বাধা দিতে অগ্রসর হতেন, তাহলে বোধ হয় তরোয়ালের ঘায়ে সেদিন তাঁদের মাথা কাটা যেত।"

টেইলার সাহেব পাটনা শহরে আদেশ জারী করে দিলেন, যার হাতে যা কিছু অস্ত্র আছে সব জমা দিয়ে দিতে হবে। দু'নম্বর আদেশ, রাত্রি ন'টার পর কেউ বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে না। এ আদেশ কার্যকরী করবার অর্থ গুপ্ত সমিতির কাজ বন্ধ করে দেওয়া।

পাটনার বিদ্রোহীরা আশা করছিল দানাপুরের সিপাইরাই প্রথমে বিদ্রোহ করবে। সে নিশানা দেখে পাটনার বিদ্রোহীরা মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু দানাপুরের সিপাইরা বড় বেশী দেরী করে ফেলছিল। এদিকে সরকারের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে! নেতাদের গ্রেফতারের ফলে সকলেই উত্তেজিত। তা ছাড়া যে ভাবে গ্রেফতারের পালা শুরু হয়েছে তাতে দুদিন বাদে টিকে থাকাই মুস্কিল হবে।

এ সমস্ত চিন্তা করে তারা ঠিক করল, আর দেরি করা যায় না। দানাপুরের জন্য অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা না করে যা করবার এখনই করতে হবে। দেরী করলে পরে আর সময় নাও মিলতে পারে।

৩রা জুলাই, ১৮৫৭ সাল।

মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, দীন, বোলো দীন!

শহরবাসী চমকে উঠল। প্রায় দুশো জেহাদী মিছিল করে বেরিয়েছে। স্বাধীনতার সবুজ ঝাণ্ডা নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। তারা ছুটে চলেছে গীর্জার দিকে যেখানে সাহেবরা সবাই জমায়েত হয়েছে।

আফিম বিভাগের ডাঃ লায়াল ছুটে আসছিলেন সে পথ দিয়ে। বিদ্রোহীদের গুলীতে তিনি মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ র‍্যাটরে তার শিখ সৈন্যদের নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জেহাদীরা

www.pathagar.com

প্রতিরোধ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত এক দল লোক, হাতে অস্ত্র ছিল তাদের সামান্যই, সুশিক্ষিত সশস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে আর কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে!

এ ভাবে পাটনার অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পরিণত হোল। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে এ ঘটনাটি খুব বড় নয়, কিন্তু তবুও উল্লেখযোগ্য। পাটনার নাগরিকেরাই প্রথমে অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিল। সিপাইরা বিদ্রোহ করেছিল পরে, তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

www.pathagar.com

একটি বদমাইসের কাহিনী

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়ছিলাম। পাটনার বিদ্রোহীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গ্রন্থকার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ "কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত বদমাসকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন পুস্তক বিক্রেতা।"

সে বদমাসের কাহিনীই এখন বলব।

পাটনা শহরের একজন সাধারণ পুস্তক বিক্রেতা, নাম পীর আলী। পাটনা শহরের অনেকেই তাঁকে চিনত। পথ দিয়ে যে সব মানুষ চলাচল করত, তারা দিনের পর দিন দেখেছে পীর আলীকে। তারা কি কখনও ভাবতে পেরেছে এ রুক্ষমূর্তি অতি সাধারণ চেহারার মানুষটার মধ্যে কি এক আগুন অনির্বাণ দিবারাত্রি জ্বলছে! পরাধীনতার গ্লানি পীর আলীর জীবনে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিদেশীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবই, এ একটি কথা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ মন্ত্রে তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কত লোককে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন! পীর আলী তাঁর এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিলেন। সমিতিকে গড়ে তুলবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন।

পীর আলীর জীবন ইতিহাস আমরা খুব কমই জানতে পেরেছি। পাটনার অভ্যুত্থানের আগে তাঁর সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। তারা ভাবতেও পারেনি সামান্য দরিদ্র এক পুস্তকবিক্রেতার ছদ্মবেশে কত বড় একজন সংগঠক বৃটিশবিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছেন। তিনি ধরা পড়বার পর তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে আসে, তাতে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা জানতে পারলো পীর আলী এবং তাঁর সহকর্মী সেখ ঘাসিতা তাঁদের কার্যোদ্ধারের জন্য নিয়মিত অর্থ যুগিয়ে বহুসংখ্যক কর্মীকে প্রতিপালন করতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু পীর আলী ও ঘাসিতা দুজনেই অত্যন্ত গরীব। এত টাকা কোথায় পেতেন তাঁরা? খোঁজ করতে করতে সূত্রটা বেরিয়ে পড়ল। সূত্রটা খুবই কাছে ছিল কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন। ঘাসিতার মনিব লুৎফ আলী খাঁ পাটনা শহরের সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্কার। বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক আর তার দরিদ্র ভৃত্য দুজনে একই মন্ত্রে দীক্ষিত! মিঃ টেইলার এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছিলেন। লুৎফা আলী খাঁকে ফাঁসাতে তিনি কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু প্রমাণের অভাবের জন্যই হোক বা টাকার জোরেই হোক, লুৎফ আলীকে কিছুতেই জড়ানো গেল না, তিনি অক্ষত দেহে বেরিয়ে এলেন।

পাটনার বিদ্রোহের নেতাদের সম্পর্কে আগে যে ধারণাই থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে পীর আলীই ছিলেন বিদ্রোহের মূল পরিচালক। সামান্য একজন পুস্তক বিক্রেতা হলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। গুপ্ত সমিতির পরিচালনায় তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এবং এ বাহিনীর তিনিই ছিলেন নেতা।

মীরাটে সিপাইদের অভ্যুত্থানের পর কমিশনার মিঃ টেইলার পাটনার আসন্ন বিদ্রোহকে চাপা দেবার জন্য গ্রেফতার ও অত্যাচারের রোলার চালাতে শুরু করে দিলেন। পীর আলী অত্যন্ত কঠিন ও তেজস্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন। দেশের উপর এ জুলুম হতে দেখে এতদিনকার পরিপক্ক বিদ্রোহী, যে সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, সে সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তাঁর এ অধৈর্য টেইলারের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দিল।

কথা ছিল দানাপুরের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, তবে তাঁরা অস্ত্র হাতে পথে নামবেন। দানাপুরকে পিছনে ফেলে অধৈর্য হয়ে তাঁরা একাই সামনে এগিয়ে গেলেন। তার ফলেই ঘটল ৩রা জুলাইর শোচনীয় পরিণতি।

পীর আলী ভুল করেছিলেন। সে ভুলের মাশুল দিতে তাঁদের সর্বস্বান্ত হতে হোল। তিনি পরে একথা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সে কথা

www.pathagar.com

স্বীকার করেছেন। বলেছেন, এ কাজ তাঁর সময়োচিত হয় নি, তাঁর অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

পাটনার অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকবার অভিযোগে একত্রিশ জন লোককে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে চৌদ্দ জনকে সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। এ চৌদ্দজনের মধ্যে পীর আলী ও সেখ ঘাসিতাও ছিলেন।

হাতে পায়ে কঠিন শিকল দিয়ে বাঁধা পীর আলীকে কমিশনার টেইলারের কাছে উপস্থিত করা হোল। তাঁর গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, রক্তে লাল হয়ে উঠেছে পরনের কাপড়। পীর আলীর তাতে দৃকপাত নেই—দৃঢ় কঠিন অবিচল।

মিঃ টেইলার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলেন: "পীর আলী, ভেবে দেখ এখনও বেঁচে যেতে পার যদি তোমাদের সমস্ত গোপনীয় কথা খুলে বল, তোমাদের আর সব নেতাদের নাম বলে দাও।"

পীর আলী স্থির শান্ত দৃষ্টিতে কমিশনারের দিকে তাকালেন তারপর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "এমন কতগুলি অবস্থা আছে, যখন নিজের প্রাণ বাঁচানোটাই বাঞ্ছনীয় মনে হয় আবার এমন কতগুলি অবস্থা আছে যখন জীবন বিসর্জন দেওয়াটাই একমাত্র কাম্য। আমি এখন দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে আছি। আমি যদি আজ মৃত্যুকে বরণ করি তা হলেই আমি শাশ্বত জীবনের সন্ধান পাব।"

তারপর তিনি স্পষ্টভাষায় ইংরাজদের অত্যাচার ও কমিশনারের দৌরাত্ম্যের কথা বর্ণনা করে বললেন: "তোমরা আমাকে ফাঁসি দিতে পার আমার মত অনেক লোককে তোমরা ফাঁসি দিতে পার কিন্তু তোমরা আমাদের আদর্শকে ফাঁসি দিতে পারবে না। আমি মরে গেলে আমার রক্ত থেকে হাজার হাজার বীর জন্মলাভ করবে তারাই তোমাদের ধ্বংস করবে।"

ফাঁসি হওয়ার আগে পীর আলী বললেন, "আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে।"

"বল।" কমিশনার অনুমতি দিলেন।

"আমার বাসগৃহ ?"

www.pathagar.com

"ভূমিস্মাৎ করা হবে।"

"আমার সম্পত্তি?"

"সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবেন।"

"আমার ছেলেমেয়েরা?" পীর আলীর কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত হয়ে এল। এই তাঁর প্রথম ও শেষ দুর্বলতা প্রকাশ।

"তারা কোথায় আছে?

"অযোধ্যায়।"

"অযোধ্যার বর্তমান অবস্থায় তাদের খোঁজ খবর করা সম্ভব নয়।"

কমিশনার এ বিষয়ে কোন ভরসা দিতে পারলেন না।

পীর আলীর আর কোন কথা বলবার ছিলনা। ফাঁসির মঞ্চে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে এতটুকু বিচলিত দেখা যায় নি। আমার এ কাহিনীর এখানেই শেষ।

কিন্তু আমরা শেষ করে দিলেই তো আর সব শেষ হয়ে যায় না।

"আমার রক্ত থেকে হাজার হাজার বীর জন্মলাভ করবে," মহান শহীদের এ কথাটি মিথ্যা হয় নি। তাঁদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দানাপুরের 'সবচেয়ে প্রভুভক্ত' বলে খ্যাত রেজিমেণ্টটিও ২৫শে জুলাই তারিখে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। গোরা রেজিমেণ্ট ও গোলন্দাজ বাহিনীর উপস্থিতি সত্বেও তিনটি ভারতীয় রেজিমেণ্টের সৈন্য ঘৃণাভরে কোম্পানীর উর্দী ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শোন নদীর দিকে যাত্রা করল।

www.pathagar.com

কুমার সিং

পশ্চিম বিহারের জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ওৎ পেতে বসে থাকে। শোন নদীর তীরে তীরে বাঘ শিকারের আশায় ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ বুঝলেই শিকারের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। বুড়ো বাঘ, আশি বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু তাই বলে নখদন্তহীন নয়। তাঁর ভয়ে ওরা সন্ত্রস্ত, তাঁর আতঙ্কে ইংরাজ সেনা-পতিদের চোখে ঘুম আসে না।

পশ্চিম বিহারের জঙ্গলের মধ্যে কুমার সিং তাঁর দলবল নিয়ে বসে থাকেন। শোন নদীর তীরে তীরে ফিরিঙ্গীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে ঘুরে বেড়ান আর সুযোগ বুঝলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল লক্ষ্ণৌর উপর আক্রমণ চালাবার জন্য আজিমগড় থেকে গুর্খা ও ইংরাজ সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত মুহূর্ত! কুমার সিং নির্দেশ দিলেন—তৈরী থাকো! ১৮৫৮ সালের ১৮ই মার্চ বীভা থেকে বিদ্রোহীরা এসে যোগ দিল। মিলিত বাহিনী এট্রোলিয়ার দুর্গের কাছে এসে তাঁবু খাটিয়ে বসল।

আজিমগড় থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। যাকে ধরবার জন্য কত জায়গায় কত না জাল ফেলা হয়েছে সে বাঘ আজ নিজেই চলে এসেছে হাতের মুঠোর মধ্যে। আরও খবর পাওয়া গেছে সৈন্যসংখ্যা বেশী নয়, সঙ্গে একটা কামান পর্যন্ত নেই। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে!

উপযুক্ত মুহূর্ত! মিঃ মিলম্যান নির্দেশ দিলেন—এট্রোলিয়া!

তিনশো পদাতিক ও সওয়ার সৈন্য আর সঙ্গে দুটি কামান। মিঃ মিলম্যান পাকা শিকারী, বাঘ শিকারে ছুটলেন। বুড়ো বাঘটা বিষম জ্বালাতন করছে।

এট্রোলিয়ার ময়দানে দু'দলে সংঘর্ষ বাঁধল। একদিকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হাল আমলের সুশিক্ষিত সৈন্য, অন্য দিকে এখান থেকে ওখান থেকে কুড়িয়ে কাচিয়ে সংগ্রহ করা কতগুলি মানুষ, যাদের না আছে সামরিক

www.pathagar.com

শিক্ষা না শৃংখলা। কতক্ষণ আর টিকে থাকবে! কুমার সিং-এর বাহিনী এক ধাক্কাতেই কাত। চুড়ান্ত ভাবে পরাস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। মিলম্যান আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। সঙ্গে একটু আফশোষও ছিল। বুড়ো বাঘটাকে ধরা গেল না। কোথায় কতদূরে কোন জঙ্গলে গিয়ে আবার সেঁদিয়েছে কে জানে! ধরতে পারলে নাম ও ইনাম দুইই মিলত।

যাক গে! ইংরাজ সৈন্যেরা পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে বসল। কেটলীতে চায়ের পানি টগবগ করে ফুটছে! আঃ, সবাই পরিশ্রান্ত, যুদ্ধের পরে খানাটা ভালই জমবে।

ও কি, ও কিসের শব্দ! ওদিক থেকে কারা সব ছুটে আসছে? বাঘ! বাঘ! আর সন্দেহ নেই, পালে বাঘ পড়েছে। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত কুমার সিং বাঘের মতই এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মিলম্যান! মিলম্যান! দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও! এমন সাজানো আসরটা ভেঙ্গে চুরে ছত্রখান হয়ে পড়ল যে! আহা, এমন সুন্দর খানাটা! মদের কাপগুলো কি এমনি করেই গড়াগড়ি যাবে?

কিন্তু মিলম্যান দাঁড়ালেন না। একছুটে আজিমগড়ে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কোথায় আর বাঁচলেন! কুমার সিং পিছন পিছন ধাওয়া করে একেবারে আজিমগড়ের দুয়ার পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছেন।

খবর পেয়ে বারানসী ও গাজীপুর থেকে তিনশ' পঞ্চাশ জন তরতাজা সৈন্য নিয়ে কর্ণেল ডেম্‌স্‌ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। ২৮শে মার্চ কর্ণেল ডেম্‌স্‌ কুমারসিংকে আক্রমণ করে চেপে ধরলেন। কুমার সিং যথারীতি পরাজিত হলেন। তারপর? তারপর সে একই খেলা, একই ইতিহাস। কর্ণেল ডেম্‌স্‌ এমন মার খেলেন যে আজিমগড়ে ফিরে এসে ধুঁকতে শুরু করলেন।

ব্যাপারটা গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে পর্যন্ত চিন্তিত করে তুলল। বৃটিশ প্রেষ্টিজ কোথায় নেমে এসেছে! কালো লোকগুলোর সাহস বেড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা বিহিত করা দরকার। লর্ড ক্যানিংএর নির্দেশে লর্ড মার্ক'কের সসৈন্যে আজিমগড়ের দিকে ছুটলেন। খবর পেয়ে কুমার সিং তাঁর বৃহ শিথিল করে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিলেন। শত্রুপক্ষের

www.pathagar.com

কামানগুলি অগ্নি উদ্‌গীরণ করে চলল। এদিকে কুমার সিংহের হাতে একটিও কামান নেই। এ বড় বিচিত্র যুদ্ধ।

একদিকে অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল আয়োজন, অপর দিকে রণপ্রতিভা। শেষ পর্যন্ত প্রতিভাই জয়ী হোল। গোড়ার দিকে মার্ক কের কুমার সিংহের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু কোনটা 'সমুখ' আর কোনটা 'পিছন' এ নিয়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। কিছু বাদেই দেখা গেল কুমারসিং-এর সৈন্যদলের সম্মুখভাগ ইংরাজবাহিনীর পশ্চাৎভাগকে আক্রমণ করে চেপে ধরেছে। ইংরাজদের হাতীগুলি উদভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। লর্ড মার্ক কের বিস্ময়ে আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন তাদের পশ্চাৎভাগ ভীষণভাবে আক্রান্ত।

উপায়ান্তর না দেখে লর্ড মার্ক কের যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে আজিমগড়ে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। সেদিন রাত দুপুরে তিনি তাঁর সৈন্যদেয় আজিমগড়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

লর্ড মার্ক কের যে এ যুদ্ধে শুধু জয়ী হতে পারলেন না তাই নয়, আজিমগড়কে মুক্ত করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। তখন পর্যন্ত সমস্ত শহর বিদ্রোহীদের দখলে। ইংরাজ সৈন্যেরা দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু কুমারসিং একবারও দুর্গ অধিকার করতে চেষ্টা করলেন না। তাঁর মাথায় তখন এক নতুন পরিকল্পনা। শত্রুপক্ষ তা কল্পনাও করতে পারে নি।

আজিমগড়ে অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈন্যদের সাহায্যের জন্য ইংরাজ সেনাপতি লুগার্ড ঝড়ের বেগে ছুটে আসছেন। সেনাপতি লুগার্ড তাঁর সামরিক জীবনে অনেক বাঘই শিকার করেছেন। এবার দেখে নেবেন কুমার সিংকে।

লুগার্ডকে আজিমগড়ে আসতে হলে তনু নদীর সেতু পার হয়ে আসতে হবে। কুমারসিং তাঁর সৈন্যদের মধ্য থেকে বাছা একটি দলকে সেতু পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন করলেন। লুগার্ডের সৈন্যদের তারা শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখবে, যতক্ষণ না—।

যে সৈন্যদলকে সেতু রক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করে চলল। শেষে যখন বুঝল কুমার সিং এখন

www.pathagar.com

নিরাপদ, এতক্ষণে সসৈন্যে গাজীপুরের পথে বহুদূরে এগিয়ে গিয়েছেন, তখন তারা আগেকার ব্যবস্থা মত সুশৃংখলভাবে পিছু হটে ভিন্ন পথ ধরে মূল বাহিনীর সঙ্গে এসে যোগ দিল।

লুগার্ড সসৈন্যে নদী পার হয়ে এলেন। কুমার সিং বড় বেশী জ্বালাতন করে চলেছে, এবার তার সঙ্গে শেষবারকার মত বোঝাপড়া করতেই হবে। ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, কামান, বন্দুক, গোলাগুলী, কোন কিছুর অভাব তাঁর নেই। দেখে নেবেন তিনি বাঘ এবার কি করে ফাঁকি দিয়ে পালায়!

কিন্তু হায় হায়, কোথায় কুমার সিং! কে জানে কোন মায়ার বলে কুমার সিং তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন! এ কি ভোজবাজির খেলা!

তবে কি তারা গাজীপুরের পথে? সর্বনাশ! জগদীশপুরের দিকে নয় তো? কে জানে কোন মতলব নিয়ে চলেছে! বুড়ো বাঘকে বিশ্বাস নেই। ওকে পথের মধ্যেই আটকাতে হবে।

ছুটল একদল ঘোড়সওয়ার। সঙ্গে কামান নিয়ে চলেছে। কোথায় যাবে কুমার সিং? যেখানেই যাক যত দূরেই যাক তাঁর আর নিষ্কিতি নেই। পায়ে হেঁটে কত দূরেই বা আর যাবে! সওয়ার দল মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলেছে, তবু তাদের দেখা নেই। অবশেষে বারো মাইল পথ ছাড়াবার পর তারা কুমার সিং-এর নাগাল পেল।

কে যে শিকারী আর কে যে শিকার বুঝবার উপায় ছিলনা। কুমার সিং এমন প্রবলভাবে প্রতি আক্রমণ চালালেন যে তাদের থ' খেয়ে যেতে হোল। এমনটা তারা কখনোই ভাবতে পারে নি। বহু চেষ্টা করেও কুমার সিংএর ব্যূহে ভাঙ্গন ধরানো গেল না। বরঞ্চ তাঁর পালটা আক্রমণে ইংরাজ পক্ষের কয়েকজন সৈন্য, এমন কি অফিসার পর্যন্ত প্রাণ হারাল। তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ করে কুমার সিং আবার গঙ্গার দিকে ছুটে চললেন।

ভগ্নদূতের মুখে এ শোচনীয় সংবাদ শুনে জেনারেল ডগলাস আরও পাঁচ ছ'টা কামান নিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে চললেন।

মধ্যরাত্রিতে কুমার সিং-এর বাহিনী যাত্রা করল সোজা সেকেন্দরপুরের দিকে। সেখানে ঘোগরা নদী পার হয়ে তারা মীর্জাপুরে ঢুকল।

www.pathagar.com

কিন্তু বিদ্রোহীরা এ অমানুষিক পরিশ্রমের পর ক্ষুধার্ত ক্লান্ত অবসন্ন। এক পা চলবার সামর্থ্য নেই। বিশ্রাম নিতেই হবে। গ্রামের নাম মনোহর। সে গ্রামেই তারা বিশ্রাম নিতে বসল।

কিন্তু বিশ্রাম তাদের বরাতে ছিল না। জেনারেল ডগলাস পিছন পিছন কামান উঁচিয়ে ছুটে আসছেন। একটু বাদেই জেনারেল ডগলাস মনোহরে এসে পৌঁছলেন।

কুমার সিং দেখলেন তাঁর সৈন্যদল নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। ঝড়ের তাণ্ডবে নৌকা যখন ডুবুডুবু নিপুণ মাঝির মত ঝড়কে ফাঁকি দিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে ছোট ছোট কতগুলি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলের দলপতিকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে নিদিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। যে জায়গায় তারা সবাই এসে আবার একত্রে মিললেন শত্রুপক্ষ তার খোঁজ পায় নি।

অজিমগড় থেকে যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল এবার কুমার সিং তাতে বিজয়ী হলেন। ইংরাজ সৈন্যেরা অবশ্য পিছনেই ছিল। গঙ্গা পার না হওয়া পর্যন্ত হাঁফ ফেলবার যো নেই।

কুমার সিং এবার একটা নতুন চাল চাললেন। তিনি সে অঞ্চল জুড়ে একটা গুজব রটিয়ে দিলেন যে তাঁর সৈন্যেরা 'বালিলা' নামক স্থানে গঙ্গা পাড়ি দেবে। নৌকো না থাকায় তাঁরা হাতীর পিঠে চড়ে নদী পার হবেন।

জেনারেল ডগলাস 'বালিলা'তে গিয়ে কুমার সিংকে ধরবার জন্য ওৎ পেতে বসে রইলেন। ওদিকে 'বালিলা' থেকে সাত মাইল দূরে শিউপুরহাটে তখন গঙ্গা পার হবার জন্য তোড়জোড় চলেছে।

কিন্তু কি করে পার হবেন? শিউপুরঘাটে একটি নৌকোও তো নেই। কিন্তু কুমার সিং সেখানে এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে নৌকোর ভাবনা তাঁকে আর ভাবতে হোল না। খবর পেয়ে গ্রামের লোকেরা নিজেরাই এগিয়ে এল। বলল, ভয় কিসের, আমরা দিচ্ছি নৌকো। দেখতে দেখতে তাদের চেষ্টায় অনেক নৌকো এসে জড় হোল।

www.pathagar.com

ঠিক সে সময় ইংরাজদের 'মেঘনা' নামে একটা সশস্ত্র ষ্টীমার কুমার সিংকে বাধা দেবার জন্য গঙ্গার বুকে টহল দিয়ে ফিরছিল।

শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে কুমার সিং গঙ্গা পার হলেন। শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে ইংরাজ সৈন্যেরা সদলবলে শিউপুরঘাটে এসে জমায়েত হোল। কিন্তু কুমার সিংএর প্রায় সমস্ত সৈন্যই তখন ওপারে চলে গিয়েছে।

কুমার সিং তখনও ওপারে যান নি, নদীর মাঝামাঝি একটা নৌকোর উপরে ছিলেন। ইংরাজ সৈন্যেরা এপার থেকে গুলী চালিয়ে যাচ্ছিল। তারই একটা গুলী কুমার সিং-এর হাতের কব্জিতে গিয়ে বিঁধল। আশী বছরের বৃদ্ধ কুমার সিং তাতে একটুও ঘাবড়ালেন না। শোনা যায়, হাতটাকে বাদ দিতেই হবে একথা বুঝতে পেরে তিনি নাকি নিজের হাতেই ওই হাতটাকে কনুই পর্যন্ত কেটে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন।

কুমার সিং আবার তাঁর সাহাবাদের বনাঞ্চলে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন তাঁর নিজের জগদীশপুরে। ২২শে এপ্রিল তিনি তাঁর পুরানো রাজধানীতে এসে প্রবেশ করলেন। আট মাস আগে এখান থেকে তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল।

গঙ্গা পার হবার আগেই তাঁর ভাই অমর সিং দেশপ্রেমিক কৃষক ও গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি দেশরক্ষী বাহিনী গঠন করে তুলেছিলেন। তাঁর সে বাহিনী নিয়ে তিনি কুমার সিং-এর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন।

এমন দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে জগদীশপুরের ঘটনাটা ঘটে গেল যে আরা শহরে যে সমস্ত ইংরাজ অফিসাররা ছিলেন, ব্যাপারটা টের পেতে তাদের কিছুটা সময় লেগে গেল। অথচ বিশেষভাবে জগদীশপুরের উপর নজর রাখবার জন্যই তাদের সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল।

খবরটা পেয়ে সেখানকার জেনারেল লা গ্রাণ্ড প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। শেষে ২৩শে এপ্রিল তারিখে আরা থেকে চারশো ইংরাজ সৈন্য দুটো কামান নিয়ে জগদীশপুর আক্রমণ করল। ইংরাজদের কামান দুটো জগদীশপুরের দিকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠল। কিন্তু জগদীশপুরের পক্ষ থেকে কামানের প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

সম্মুখ আক্রমণের হুকুম পেয়ে ইংরাজ সৈন্যেরা সঙ্গিন উঁচিয়ে দুর্দমবেগে ছুটে গেল। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। সাহসী ইংরাজ সৈন্যেরা কে জানে কেন, হঠাৎ বিভ্রান্তের মত ঊর্ধশ্বাসে পিছনদিকে ছুটতে লাগল। এর কারণ কি আজও জানা যায় নি। শিকারীর তাড়া খাওয়া হরিণের মত তারা বনাঞ্চল থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর যে যে দিকে পারল ছুটে পালাল। কুমার সিং-এর সৈন্যেরা তাদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করে চলল।

একজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে এ জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে ঃ

"এর পর যা ঘটল, তা বর্ণনা করতে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আমরা পালিয়ে আসতে লাগলাম। শত্রু আমাদের পদে পদে পরাজিত করে চলল। তখন আমাদের কারো মধ্যে লজ্জা বলে কোন পদার্থ ছিল না। যে যেখানে নিরাপদ মনে করেছে সেদিকেই ছুটে পালিয়েছে। উপরওয়ালার হুকুম শুনবে কে, শৃংখলার কোন বালাই তো ছিল না। চারদিকে দীর্ঘশ্বাস, অভিশম্পাত আর বিলাপ ছাড়া আর কোন কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। যারা পালাচ্ছিল তাদের মধ্যে দলে দলে লোক সর্দি গর্মি হয়ে মারা যাচ্ছিল। ওষুধ দেবে কে? তার তো কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ কুমার সিং ইতিপূর্বেই আমাদের ডাক্তারখানাকে দখল করে নিয়েছে। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গেই মরে যাচ্ছিল। বাকী সবাইকে এক দিক থেকে কেটে চলেছিল শত্রুরা। বাহকেরা ডুলী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। চারদিকে বিশৃংখলা, চারদিকে আতংক! স্বয়ং জেনারেল লা গ্রাণ্ড শত্রুর গুলীতে ধরাশায়ী। শিখরা এ গরমে অভ্যস্ত। তারা আর সবাইকে ফেলে হাতীগুলি নিয়ে পালিয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কেউ থাকতে রাজী নয়। একশ' নিরানব্বই জন শ্বেতাঙ্গের মধ্যে মাত্র আশি জন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। গরুগুলিকে যেমন জবাই করবার জন্য কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, আমাদেরও যেন সে উদ্দেশ্যেই জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

[চার্লস বল রচিত 'ভারতীয় বিদ্রোহ']

এর দু এক দিনের মধ্যে কাটা হাত দূষিত হয়ে যাবার ফলে কুমার সিং-এর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী রোহিলা

রোহিলা!

ভারতের ইতিহাসের অতি অর্বাচীন ছাত্র, সেও তাদের নাম জানে। মুক্ত স্বাধীন বীর পাঠান জাতি। শান্তিতে বসবাস করছিল, ইংরাজের লুব্ধ দৃষ্টি তার উপরে গিয়ে পড়ল। তার শান্তির সংসারে আগুন লাগল। ইংরাজের কুট চক্রান্ত! মুক্ত রোহিলা পরাধীনতার শৃংখলে বাঁধা পড়ল।

কিন্তু রোহিলারা সে কথা ভূলতে পারেনি। এ লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। বেরিলী তথা সমগ্র রোহিলখন্দ জুড়ে বৃটিশ বিরোধী প্রচারণা গোপনে গোপনে কাজ করে চলেছিল। অসন্তোষ আর বিক্ষোভের চাপা আগুন ধুমায়িত হয়ে উঠতে উঠতে ১৮৫৭ সালে তার চরম রূপ ধারণ করল।

রোহিলখন্দের সিপাইদের কাছে স্বাধীন দিল্লী থেকে আহ্বান এসেছে ভারতের স্বাধীনতার পতাকাকে ঊর্ধে তুলে ধরবার জন্য ঃ

"দিল্লীর সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির পক্ষ থেকে বেরিলীর সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিকে সাদর আলিঙ্গন! ভাই সব, দিল্লীতে ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলেছে। আল্লাহ্‌র রহমতে প্রথম যুদ্ধে হেরে গিয়ে ওদের মন ভেঙ্গে গিয়েছে। অন্য সময় দশ বার হারলেও মনের অবস্থা এমন হোত না। বীরগণ দলে দলে দিল্লীর দিকে চলে আসছে। যদি তোমরা এখন খেতে বসে থাকো, খত পেয়েই অবিলম্বে চলে এসো, এখানে এসে হাত ধোবে। শাহান্‌শাহ্‌ দিল্লীর সম্রাট তোমাদের বিপুল অভিনন্দন জানাবেন, তোমাদের কাজের জন্য যথোচিত পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের কামানের গর্জন শুনবার জন্য আমাদের কান উৎসুক হয়ে আছে, তোমাদের দেখবার জন্য আমাদের চক্ষু পিপাসিত। এসো, অবিলম্বে

www.pathagar.com

চলে এসো। ভাই সব, বসন্ত যদি না আসে, গোলাপের ডালে কি করে ফুল ধরবে! দুধ যদি না পাওয়া যায়, শিশু বাঁচবে কি করে!"

শেষ স্বাধীন রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমতের বংশধর খান বাহাদুর খান গুপ্ত সমিতির জাল বুনে চলেছেন। তিনি পেনসন ভোগী। হাফিজ রহমতের বংশধর হিসাবে একটা পেনসন পান আর একটা পেনসন পান ইংরাজের অধীনে বিচার বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারী হিসাবে।

ইংরাজের পেয়ারের লোক বলে সারা প্রদেশ জুড়ে তিনি পরিচিত। তাঁর উপর সরকারের গভীর বিশ্বাস। আবার তিনিই হচ্ছেন বেরিলীর গোপন সংগঠনের মধ্যমণি।

দিল্লী থেকে ডাক এসেছে, অবিলম্বে চলে এসো।

কিন্তু তা কি করে হয়! ৩১শে মে যে নির্ধারিত দিন। সে পর্যন্ত যে অপেক্ষা করতেই হবে। ক'দিন আগে একশো জন মীরাট-বিদ্রোহী এসেছিল। তারা সিপাইদের লাইনেই থাকত গোপনে, বাইরের লোকের চোখ এড়িয়ে। মীরাটের কাহিনী বর্ণনা করে এখানকার সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

তারপর ঘূর্ণি হাওয়ার মত চলে গেছে স্থানান্তরে। সিপাইদের মধ্যে গভীর উত্তেজনা, কিন্তু বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজ করছে। ২৯শে মে তারিখে একটা গুজব শোনা গেল, সকাল বেলা নদীতে গোসল করতে গিয়ে সিপাইরা নাকি কসম করেছে যে তারা ইংরাজদের কেটে শেষ করবে। সারা দিন চলে গেল। কোন সাড়া শব্দ নেই। সিপাইরা কোন কিছুই করল না। ২৯শে গেল, ৩০শে গেল, কোন ঘটনাই ঘটল না। বিশেষ করে শেষের দিনটায় সিপাইদের ব্যবহার যেন আরও মধুর হয়ে উঠল।

কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন, বিপদটা এবারকার মত ভালোয় ভালোয় উতরে গেছে, আপাততঃ ভয় করবার কিছুই নেই।

৩০শে মে'র রাত্রি ভোর হোল। ৩১শে মে'র রক্ত রাঙ্গা সূর্য দিগন্তের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আকাশের বুকে দেখা দিল, আর সব দিনকার মতই। তবু এ দিনটি আর সব দিনের মত নয়। কি একটা নতুন আশা, নতুন

www.pathagar.com

সুর বয়ে নিয়ে এসেছে। কত লোক উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে এ দিনটির দিকে।—কি হয়, কি হয়।

বেলা এগারোটা বাজল। সিপাই লাইনে একটা তোপের আওয়াজ শোনা গেল। তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই কতগুলি রাইফেলের ঝন্‌ঝনা শোনা গেল। আর শোনা গেল আকাশ ফাটানো তীক্ষ্ণ চীৎকার।

বেরিলীর বিদ্রোহীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের পরিকল্পনা রচনা করেছিল। অত্যন্ত নিখুঁত ও সুশৃংখল। কে কোন অফিসারকে হত্যা করবে, তাও আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল। মাত্র বত্রিশ জন অফিসার সেদিন প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন। তাঁরা ওখান থেকে নিরাপদে নৈনিতাল গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ইংরাজের প্রভুত্বের সমস্ত চিহ্ন মাত্র ছ'দিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেল।

যেখানে যেখানে ইউনিয়ন জ্যাক ছিল, টেনে টেনে নামানো হতে লাগল, আর তার জায়গায় উড়তে লাগল জাতীয় পতাকা।

গোলন্দাজ বাহিনীর সুবাদার বখ্‌ত্‌ খাঁ সমস্ত সৈন্যবাহিনীর উপরে সেনাপতির পদে নিযুক্ত হলেন।

শাহজাহানপুরের সিপাইরা ১৫ই মে তারিখে মীরাটের সংবাদ পেয়েছিল। কিন্তু সিপাইদের চালচলন ও কথাবার্তার মধ্যে কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না। কর্তৃপক্ষ তাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ৩১শে মে'র সকালবেলাও অন্যান্য দিনের মতই শান্ত। বিদ্রোহের কোনই আভাস পাওয়া যায় নি। অথচ সে দিন সন্ধ্যার আগেই শাহজাহানপুরে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়ল।

বেরিলীর উত্তর পশ্চিম দিকে আট চল্লিশ মাইল দূরে মোরাদাবাদ শহর। কর্তৃপক্ষ সংবাদ পেলেন ১৮ই মে তারিখে এক দল মীরাট-বিদ্রোহী মোরাদাবাদের কাছাকাছি কোথাও এসে আস্তানা নিয়েছে।

২৯নং রেজিমেণ্টকে সে রাত্রিতেই তাদের উপর আক্রমণ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোল। বিদ্রোহীরা নাকি বনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল। উপরওয়ালাদের নির্দেশে ২৯নং রেজিমেণ্ট তাদের উপর আক্রমণ করল।

www.pathagar.com

কিন্তু বিদ্রোহীদের কেশ স্পর্শ করা গেল না। সব পালিয়েছে। গভীর অন্ধকার রাত্রি। চোখে কিছুই দেখা যায় না, সিপাইরা আর কি করতে পারে!

২৯নং রেজিমেণ্ট ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। কর্তৃপক্ষও তাই বিশ্বাস করলেন। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল যে আক্রমণটা নেহায়েৎ লোক দেখানো। আরও মজার কথা এই যে যাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই নাকি মোরাদাবাদের সিপাইদের আশ্রয়েই সে রাত্রিটা কাটিয়েছিল।

সেদিনকার এ আক্রমণের ফলে ২৯নং রেজিমেণ্টের উপর ইংরাজদের ষোল আনা বিশ্বাস এসে গিয়েছিল। পূরো মে মাসটা তাদের চালচলন থেকে সন্দেহ করবার কোনই কারণ ঘটে নি।

৩১শে মে সকাল বেলা কোন যাদুমন্ত্রে সব কিছুই উল্টে গেল। ইংরাজ অফিসাররা হতবুদ্ধি হয়ে দেখলেন সিপাইরা দলে দলে প্যারেডের ময়দানে গিয়ে জমায়েত হচ্ছে। অফিসাররা এর কৈফিয়ৎ চাইলে সিপাইরা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিল: "কোম্পানীর রাজত্ব আজ থেকে শেষ হয়ে গেল। তোমাদের আজই, এখনই এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তা না হলে একজনও প্রাণে বাঁচবে না। এ মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, তৈরী হবার জন্য দু'ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এই দু'ঘণ্টা পার হবার আগেই তোমাদের মোরাদাবাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

মোরাদাবাদের পুলিশ জানিয়ে দিল, এখন থেকে তারা আর ইংরাজদের হুকুম মান্য করে চলবে না। শহরের লোকেরাও তাদের কথায় সমর্থন জানাল। সিপাইরা তোষাখানা ও অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি অধিকার করে নিল।

সন্ধ্যার আগেই মোরাদাবাদের আকাশে সবুজ নিশান পত পত করে উড়তে লাগল।

বখ্‌ত্‌ খাঁর নেতৃত্বে সমস্ত সিপাই দিল্লীর দিকে যাত্রা করল। খান বাহাদুর খান রাজধানী তথা সারা প্রদেশের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করবার

www.pathagar.com

জন্য নতুন করে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে লাগলেন। নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই এ বাহিনীতে যোগ দিলেন।

বেসামরিক বিভাগে যে যে পদে কাজ করতেন, তারা সেখানেই কাজ করতে লাগলেন। প্রধান প্রধান পদগুলি এতদিন ইংরাজদের হাতেই ছিল, ভারতীয়েরা এখন সে সমস্ত পদে নিযুক্ত হলেন। দিল্লীর সম্রাটের নামে নতুনভাবে ভূমি-কর ধার্য করা হোল। এক কথায় বলতে গেলে বিদ্রোহের ফলে কোন বিভাগের কোন কাজে কোনরূপ ভাঙ্গন ধরল না। একমাত্র তফাৎ হল এই, আগে যেখানে বড় বড় পদগুলি ছিল ইংরাজদের হাতে, এখন ভারতীয়দের দিয়ে সে শূন্য স্থানগুলি পূরণ করা হোল।

খান বাহাদুর খানের নামে প্রকাশিত ইশ্‌তাহার সমস্ত রোহিলখন্দের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হতে লাগল ঃ

"হিন্দুস্তানের অধিবাসীগণ, বহুদিনের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা উৎসব আজ সমাসন্ন। আপনারা কি তাকে গ্রহণ করবেন, না ফিরিয়ে দেবেন? আপনারা কি এই বিরাট সুযোগ কাজে লাগাতে চান, না অবহেলা করে তাকে হাতছাড়া করবেন? হিন্দু মুসলমান ভাই সব, একথা আপনারা সবাই জেনে রাখুন, এ ইংরাজরা যদি আমাদের দেশে টিকে থাকতে পারে, তারা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে, আমাদের ধর্মকে বিনষ্ট করবে।"

"হিন্দুস্তানের অধিবাসীগণ, এতদিন ধরে আমরা ইংরাজদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজেরা নিজেদের গলায় ছুরী মেরে এসেছি। এখন থেকে আমরা দেশদ্রোহিতার কলংক থেকে নিজেদের মুক্ত করব। ইংরাজরা তাদের সে পুরানো কায়দায় আমাদের প্রতাড়িত করবার চেষ্টা করবে, একথা জেনে রাখবেন।

"কিন্তু হিন্দু ভাই সব, ওদের এই জালে পা দেবেন না। আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা বুদ্ধিমান। তাদের এ কথা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন করে না যে ইংরাজরা কখনোই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেনা। তারা কৌশল, চালবাজি ও শঠতায় পারদর্শী। তারা আগাগোড়া এ চেষ্টাই করে আসছে যাতে পৃথিবীর বুক থেকে একমাত্র তাদের ধর্ম ছাড়া তারা

www.pathagar.com

আর সমস্ত ধর্মকে উন্মূল করে দিতে পারে। দত্তক সন্তান গ্রহণের অধিকারকে কি তারা ঠেলে ফেলে দেয় নি? আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে কি তারা একটির পর একটি গ্রাস করে নেয় নি? নাগপুর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে কে? কে কেড়ে নিয়েছে লক্ষ্ণৌ? হিন্দু আর মুসলমানকে পদদলিত করেছে কে?"

"মুসলমান, যদি তোমার কোরআনের উপর ভক্তি থেকে থাকে, হিন্দু, তোমার গোমাতার উপর যদি তোমার ভক্তি থেকে থাকে, তাহ'লে তোমাদের মধ্যে যে সামান্য বিভেদ রয়েছে, তা ভুলে নিয়ে পবিত্র জেহাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। একই পতাকার নীচে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়, রক্তের বন্যায় ভারতের বুক থেকে ইংরাজের নাম ভাসিয়ে নিয়ে যাও। এ যুদ্ধে হিন্দু যদি মুসলমানের সঙ্গে হাত মিলায়, আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তারাও যদি যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসে, তাহলে তাদের দেশাত্মবোধের পুরস্কার স্বরূপ গোহত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। যারা এ পবিত্র জেহাদে যোগদান করবেন বা অর্থ দিয়ে অপরকে যুদ্ধ করতে সাহায্য করবেন তাঁরা ঐহিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করবেন। কিন্তু যারা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে বাধা দেবে, তারা নিজেদের মাথায় নিজেরা কুড়াল মারবে এবং আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী হবে।"

www.pathagar.com

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা

গভীর রাত্রি। দরজার উপর বারে বারে ঘা পড়তে লাগল। কে যেন ডাকছে। কমিশনার এডওয়ার্ডিস ও মেজর নিকলসন একই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। শব্দ শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

দরজা খুলে দিতে এক জন লোক এসে ঘরে ঢুকল। জরুরী সংবাদ। দুঃসংবাদ। ৫৫ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের অর্ধেক ব্যাটালিয়ান বিদ্রোহী হয়ে দল ত্যাগ করে পালিয়েছে।

যা ভয় হয়েছিল তাই। পেশোয়ারেও তা হলে শুরু হয়ে গেল। তাঁরা তখনই জেনারেল কটনের কাছে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, একমাত্র ২১ নং বেঙ্গল ইনফ্যানট্রিকে বাদ দিয়ে আর সমস্ত সৈন্যকে নিরস্ত্র করুন। ২১ নং বেঙ্গল ইনফ্যানট্রি সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

সকাল হতেই অস্ত্র কেড়ে নেবার কাজ শুরু হয়ে গেল। সিপাইরাও অবস্থা সঙ্গীন দেখে কোন উচ্চবাচ্য না করে যার যার হাতের অস্ত্র জমা দিয়েদিল।

অফিসারদের অনেকেরই এতে মত ছিল না। তাঁরা মনঃক্ষুন্ন হলেন।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় বৃটিশ ইররেগুলার ক্যাভেলরি ও মুলতান ক্যাভেলরি মর্দানে গিয়ে উপস্থিত হোল। ৫৫ নং রেজিমেণ্টের কিছু লোক মর্দানেও ছিল। এ রেজিমেণ্টের কর্ণেলের নিজের সৈন্যদের উপর অখণ্ড বিশ্বাস। তিনি বারে বারেই জেনারেল কটনের কাছে এদের সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হোল না।

২৪শে মে রাত্রিতে অধীনস্থ দেশী অফিসাররা কর্ণেলকে চেপে ধরল। পেশোয়ার থেকে মর্দানে একদল সৈন্য আসছে। কেন? তাদের উদ্দেশ্যটা কি এরা তার কাছ থেকে ভাল করে জেনে নিতে চায়। সকলের

www.pathagar.com

মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কর্ণেল কি বলবেন! বলবার মুখ যে তার নেই। প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে দেশী অফিসাররা অপ্রসন্ন ও সন্দিগ্ধ চিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কর্ণেল মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন। এমন গ্লানি তিনি আর জীবনে কখনো বোধ করেন নি।

বসে বসে আকাশ পাতাল কত কি যে ভাবছিলেন। তাঁর সামরিক জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।···যাদের তিনি একান্ত ভাবে আপন বলে মনে করেন, নিজের মতই বিশ্বাস করেন, তারা আজ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছে না, শত্রুপক্ষ বলে মনে মনে সন্দেহ করছে। নাই বা করবে কেন? তিনি তো তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারছেন না। কতক্ষণ পরে কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন। জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসলেন। তারপর? তারপর হাতের রিভলবারটার নলটা কপালের উপর চেপে ধরে, রিভলবারের ঘোড়াটা টেনে দিলেন। ক্রম করে একটা শব্দ, একটু ধোঁয়া, তার পর আবার সব চুপ। সর্ব গ্লানি মুক্ত কর্ণেল গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না।

পরদিন সকাল বেলা পেশোয়ার থেকে কর্ণেল চুতের বাহিনী এসে পৌঁছল! তাদের আসতে দেখেই ৫৫ নং রেজিমেণ্টের এক ব্যাটালিয়ান তাদের নিশান, অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা পয়সা নিয়ে সোয়াদের দিকে পালিয়ে গেল!

মেজর নিকলসন একদল ঘোর সওয়ার নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে ছুটলেন। পলাতক সিপাইদের মধ্যে একশ' বিশ জন মারা পড়ল, একশ' পঞ্চাশ জন বন্দী হোল, আর বাকী চারশ' জন সৈন্য মেজর নিকলসনের হাত এড়িয়ে সোয়াদে গিয়ে পৌঁছল।

এক সপ্তাহ আগে ৫১ নং বেঙ্গল ইনফ্যানট্রি থেকে বারো জন সিপাই দলত্যাগ করে পালিয়েছিল। তাদের ধরে এনে প্যারেডের ময়দানে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এবার ৫৫ নং এর পালা। মেজর নিকলসন যে একশ' পঞ্চাশ জনকে বন্দী করে এনেছেন, তাদের মধ্যে বাছাই করে চল্লিশ জনের উপরে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হোল।

www.pathagar.com

১০ই জুন, সকাল সূর্যোদয়ের সময়। কামানগুলিকে একটির পর একটি লাইন করে সাজানো হয়েছে। ওদের দুরন্ত ক্ষুধা, খাদ্য চাই! মনে হয় যেন অধীর হয়ে উঠেছে।

ডাইনে বাঁয়ে দুদিক দিয়ে ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক দল লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে। সিপাইরা ছাড়াও সীমান্তের হাজার হাজার অধিবাসী এসে জমায়েত হয়েছে, এমন দৃশ্য দেখবার সুযোগ তো আর সব সময় হয় না। দেখবার জন্যেই তাদের বিশেষভাবে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছে। বৃটিশ শক্তি বিদ্রোহীদের আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়েছে, এ ধারণার মূলোচ্ছেদ করতেই হবে।

এ নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে ব্রিগেডিয়ার নিকলসন এসে দাঁড়ালেন। শৃংখলিত চল্লিশ জন বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের দণ্ডাজ্ঞা পড়িয়ে শোনানো হোল। তারপর কামানের মুখে বেঁধে দেওয়া হোল তাদের।

"ফায়ার!"

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-বেদনা, আশা-আশংকায় ভরা চল্লিশটি মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!

এরা মরল। মরে বাঁচল। কিন্তু এদের সাথী, বিদ্রোহের সাথী, যারা মেজর নিকলসনের হাত এড়িয়ে সোয়াদে গিয়ে পৌঁছেছিল, চরম দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এ ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক।

সে সময় সোয়াদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। দেশের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করেছে। একদিকে ঐহিক শক্তির পরিচালক 'পাদিশাহ্' অপরদিকে আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচালক 'অখন্দ' এ দুয়ের মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা চলেছে।

চারশো জন বিদ্রোহী সিপাই যুদ্ধের আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বাঁচতে হলে এক পক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে হবেই। তারা পাদিশাহের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করল। কিন্তু তাতে জীবন যাত্রার কোনই সুরাহা হোল না। পাদিশাহের কোষে অর্থ নেই, বিদ্রোহীদের কোন সাহায্যই তিনি করতে পারলেন না।

www.pathagar.com

সহায়সম্বলহীন নিরাশ্রয় বিদ্রোহীরা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ঘাটে ঘাটে ফিরতে লাগল, কোথাও ঠাঁই মিলল না। পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, পরণের কাপড় শতচ্ছিন্ন, মাথা বাঁচাবার জায়গাটুকু নেই।

এই দুর্গম বন্ধুর দেশে এ অবাঞ্ছিত মেহমানের দল নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত বৃথাই ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। যেদিকে চাও আশার চিহ্ন মাত্র নেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলোর রেখা নেই। তারা কোথায় যাবে, কে তাদের আশ্রয় দেবে!

একদিন দেখা গেল, যাকে তারা নেতা বলে নির্বাচিত করেছিল সেই শ্বেতশুভ্র সুবাদারের মৃতদেহ নদীর পানিতে ভাসছে। আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে এ অন্তিম পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে এবার শেষ চেষ্টা হিসাবে কাশ্মীরের দিকে মুখ ফেরাল। এ সিপাইরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তারা মনে মনে ভেবেছিল, হাজার হলেও কাশ্মীরের রাজা গোলাপ সিং হিন্দু। এ দুঃসময়ে হিন্দু কি হিন্দুর দিকে মুখ তুলে তাকাবে না! কিন্তু তারা জানত না যে এ বিদেশী শত্রুদের দালাল যারা, তারা মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়, তারা একটা আলাদা জাত।

মেজর বেচার কমিশনার এডওয়ার্ডিস সাহেবের কাছে এ পলাতকদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এ চিঠিতে তিনি লিখছেনঃ "ওরা প্রথমতঃ খাগানের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই ফিরল এবং কোহিস্তানের মধ্য দিয়ে আরও দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে চলল গিলগিটের দিকে। তাদের মনে আশা যে কাশ্মীরে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়তো তাদের আশ্রয় মিলবে।"

"অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন, কোন দিকে কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে তাদের একজন অফিসার গুলি করে আত্মহত্যা করল। আরও দু'একজন এর আগেই মারা গেছে। কয়েকজন খুবই অসুস্থ। ওদের সঙ্গে কোনই যানবাহন নেই, ওরা ক্ষুধার্ত!···পথ অত্যন্ত দুর্গম, সে দেশের লোকেরাও সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে চলাচল করে না। ওদের কোন আশ্রয় নেই, আমার বিশ্বাস খুব কম লোকই এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে।"

www.pathagar.com

"এ ছাড়া মহারাজ গোলাপ সিং সংবাদ পেয়ে গিলগিট সীমান্তের দিকে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে পলাতকেরা সে পথ দিয়ে গেলে তিনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তিনি গুজর এবং ওখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের হুঁশিয়ারী দিয়ে দিয়েছেন যে তারা বিদ্রোহী সিপাইদের পেলেই যেন সাবাড় করে দেয়।"

"আমার কয়েকজন বার্তাবহ এদের স্বচক্ষে দেখেছে। এরা অধিকাংশই হিন্দু। এ উলঙ্গ কংকালসার বিকৃতদেহ লোকগুলিকে দেখে সবাই ভয়ে শিউরে ওঠে। ছেলেমেয়েরা ঢিল ছোঁড়ে, মেয়েরা গালি দেয়—গোল্লায় যা, অসভ্য কালো কাফেরের দল!"

"পাকলি ও হাজারার লোকেরা আমার ডাকে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিয়েছে। আমার শিবিরে তাদের ভীড় বেড়েই চলেছে।···সীমান্তের সর্দারেরা সবাই এ ব্যাপারে আমাকে আশ্বাস দিয়েছে। খাগানের সৈয়দরা যদি তাদের সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা না রাখত, তাহলে পলাতকেরা যে সে সহজ পথ দিয়েই পালাত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অবশ্য সে পথ দিয়ে গেলেও তাদের অব্যাহতি ছিল না, কারণ মুজফফরাবাদে গোলাপ সিং-এর সৈন্যেরা তৈরী হয়েই ছিল।"

পলাতকেরা দলে দলে ধরা পড়তে লাগল। মিলিটারী আদালতের বিচারে তারা সবাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হোল। এদের মধ্যে কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, কাউকে বা তোপের মুখ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্যারেডের ময়দানে সকলের সামনেই এ দণ্ড দেওয়া হোত, যাতে তা অন্যান্যের মনে হুঁশিয়ারী ও আতংকের ভাব সৃষ্টি করতে পারে।

মেজর বেচার তাই উল্লসিত হয়ে সদম্ভে বলছেন: "এ ভাবে ৫৫নং রেজিমেণ্টের শেষ লোকটি পর্যন্ত বন্য পশুর মত আমাদের জালে ধরা পড়ল। এরই মধ্য দিয়ে আমরা বিদ্রোহী রেজিমেণ্টগুলির কাছে হিতকরী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। তাদের কাছে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি কি সুদূরপ্রসারী আমাদের শক্তি! সীমান্তের ওপারে গিয়েও অব্যাহতি নেই, সেখানে গেলেও আশ্রয় মিলবে না!"

আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এরা কেউ ভয় বা দুর্বলতা প্রকাশ করেনি।

www.pathagar.com

নির্ভীকচিত্তে, অবহেলার সঙ্গে তারা মৃত্যুকে বরণ করেছে। মরবার আগে একটি মাত্র ইচ্ছা তারা জানিয়েছিল যে তাদের কুকুরের মত ফাঁসিতে না লটকিয়ে তোপের মুখে যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ভাবে হাজারা অঞ্চলে দুশো লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

কামানের মুখে দাঁড়িয়ে, জীবনের শেষ হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে শহীদেরা হয়তো মনে মনে ভেবেছিল, ব্যর্থ হয়েছে আমাদের এ জীবন দান। আমরাও আমাদের দেশের লোকেরাও হয়তো সে কথাই মনে করি।

কিন্তু আমাদের কবি সে কথা বলেন না।

তিনি বলেন—না, না, না,

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

www.pathagar.com

উজনালার অন্ধকূপ হত্যা

অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী।

কল্পিত অন্ধকূপের কাহিনী থেকেও নৃশংস, ইচ্ছাকৃত ও বীভৎস! প্রতিপক্ষের ঐতিহাসিকের প্রচার নয়। এ অন্ধকূপ হত্যার অনুষ্ঠাতা যিনি তিনি নিজের মুখেই তার এ কীর্তিকাহিনী প্রচার করে গেছেন। করবেন নাই বা কেন? তখনকার দিনে এ যে মহা গৌরবের কথা। তার এ অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে বীরের সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর নাম ফ্রেডারিক কুপার। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার।

কল্পিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী নিয়ে দেশ বিদেশে কতই না প্রচারের ঢাক বাজানো হয়েছে! সে ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের পশু প্রকৃতিকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উদঘাটিত করে দেখাবার জন্য কত চেষ্টাই না হয়েছে!

কিন্তু কই, এ বাস্তব অন্ধকূপ হত্যার মর্মান্তিক কাহিনী দেশ বিদেশের লোক জানে কি? বেশী কথা বলে লাভ নেই আমরাই কি জানি?

ঘটনাটা ঘটেছিল পাঞ্জাবের উজনালায়।

১৮৫৭ সালের ১৩ই মে তারিখে মিঞামীরের ২৬ নং ইনফ্যাণ্ট্রিকে নিরস্ত্র করবার আদেশ দেওয়া হয়। তারা শান্ত ভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখল। বিনা কারণে এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় তারা মাটিতে মিশে যেতে চাইল। কিন্তু হতভাগ্য সিপাইরা সেদিন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত ভাষা খুঁজে পায় নি।

নিরস্ত্র সিপাইর জীবন বড়ই দুর্বহ। তাকে দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হয় না, নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনভাবে থাকতেও পারে না। গোরা সৈন্যেরা ও রাজভক্ত শিখ সৈন্যেরা সব সময় এদের চোখে চোখে রাখত। মনে মনে সন্দেহ ছিল, কি জানি, কখন কি করে বসে! এ অকর্মন্য নজরবন্দী

www.pathagar.com

জীবন তাদের কাছে ক্রমশঃই দুঃসহ হয়ে উঠছিল। খাঁচার পাখী বাইরে বেরোবার জন্য পাখা আছড়ে মরতে থাকে।

সুযোগও মিলে গেল।

৩০শে জুলাই। সেদিন হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে—ধূলোর ঝড়, যাকে বলে আঁধি। চোখে কিছুই দেখা যায় না। ধূলোর ঝাপটা এসে শন শন করে চাবুক মারছে। আতংকে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। কিসের বা নিয়ম, আর কিসের বা শৃংখলা।

২৬নং ইনফ্যানট্রি এ সুযোগ নষ্ট করল না। খাঁচার বেড়া ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ল। টের পেয়ে শিখ সৈন্যেরা দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে নির্বিচারে গুলী চালাতে লাগল। মেজর স্পেন্সার তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। সিপাইদের হাতে ছোরা-ছুরী ছাড়া কোন অস্ত্রই ছিল না। তাই দিয়ে তারা তাদের পালাবার পথ মুক্ত করল। মেজর স্পেন্সার ও সার্জেণ্ট মেজর নিহত হলেন। ফ্রেডারিক কুপার নিজেই বলেছেন যে শিখদের এ নির্বিচার গুলী চালনার ফলেই ব্যাপারটা এমন গুরুতর হয়ে দাঁড়াল, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের সিপাইরাই একই পথের পথিক হতে বাধ্য হোল।

২৬নং ইনফ্যানট্রি ধূলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘটনার এ হোল সূচনা।

ঘটনার নায়ক অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপার এ সময় রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ করলেন।

সিপাইরা প্রাণের ভয়ে ইরাবতী নদীর দিকে ছুটে চলেছে, নদীর ওপারে গিয়ে যদি কোন মতে রক্ষা পাওয়া যায়। পিছন পিছন তাড়া করে আসছেন ফ্রেডারিক কুপার। তার সঙ্গে সত্তর আশি জন সশস্ত্র সওয়ার।

নদীতীরে এসে সিপাইরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। নৌকো নেই, পার হবে কি করে! গ্রামের লোক ভয়ে সাহায্য করতে এগোল না। এর মধ্যে খবর পেয়ে উজনালা থেকে তহশিলদার সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে হাজির। নিরস্ত্র সিপাইদের উপর তারা এসে চড়াও করল। সে আক্রমনে দেড়শো সিপাই সেখানে প্রাণ দিল। ইরাবতীর বালুভূমি

www.pathagar.com

অসহায় সিপাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেডারিক কুপার তার সওয়ারদের নিয়ে নদী তীরে এসে উপস্থিত হলেন। এর পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তার বিবরণ ফ্রেডারিক কুপারের নিজের জবানী থেকেই তুলে দেওয়া হোল ঃ "সিপাইদের মধ্যে অনেকেই নদীতে ডুবে যায়। নদীর মাঝামাঝি ছোট একটা দ্বীপ ছিল। অনেকে কাঠের টুকরোর উপর ভর করে ভেসে ভেসে সেই দ্বীপের দিকে যেতে থাকে। এরা সবাই অনাহারে অবসন্ন ও পথশ্রমে ক্লান্ত। তার উপর হঠাৎ আমরা গিয়ে যখন আক্রমণ করলাম তখন সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিল। বুনো পাখীগুলি যেমন নদীর মধ্যে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে, এরাও সে রকম সাঁতার কাটতে লাগল। ওদের ধরে আনবার জন্য দুখানা নৌকো পাঠালাম। বিশ মিনিটের মধ্যে নৌকো দুটি সে দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। ভয়ে আর নিরাশায় কোন পথ খুঁজে না পেয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সিপাই আবার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তাদের ধরবার জন্য যে সওয়ারেরা গিয়েছিল তারা ওদের মাথার দিকে তাক করে গুলী করতে গেল। আমি যখন তাদের গুলী করতে নিষেধ করলাম, তখন পলাতক সিপাইরা ভাবল ডেপুটি কমিশনার সাহেব বোধ করি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করবেন। এ কথা মনে করে তারা সওয়ারদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। তারা হাত বাঁধবার সময় কোনরকম বাধা দিল না। তারা মনে করেছিল সামরিক আদালতে তাদের যথারীতি বিচার হবে এবং বিচারের আগে অন্ততঃ একবার তাদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হবে।"

"রাত দুপুরের সময় দুশো বিরাশী জন বন্দী সিপাইকে উজনালার থানায় নিয়ে আসা হোল। এ ছাড়া তাঁবুর বাহক ডুলীবেহারা প্রভৃতি অনুচরদের গ্রামের লোকদের জিম্মায় রাখা হোল। তার পর দিন অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল বলে এদের মেরে ফেলবার কাজটা স্থগিত রাখতে হয়।"

"এ কাজের জন্য ১লা আগষ্ট দিন ধার্য করা হোল। এ দিন বক্‌র ঈদের দিন। মুসলমানদের একটি প্রধান পর্ব। এ দিনেই বন্দী সিপাইদের হত্যার আয়োজন করা হোল।"

www.pathagar.com

"আমি সিপাইদের বাঁধবার জন্য বেশী করে দড়ী সংগ্রহ করে আনতে বলে দিয়েছিলাম। শিখ সৈন্যেরা দড়ী নিয়ে এলো। সে জায়গাটায় বেশী গাছ ছিল না। কাজেই এতগুলি সিপাইকে ফাসি দেওয়া সম্ভব হোত না। প্রতিবারে দশ জনকে দড়ী দিয়ে বেঁধে নিয়ে গুলী করে মারাই স্থির হোল। সিপাইরা একথা ভাবতেও পারেনি। যখন জানতে পারল, খুবই বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

প্রতিবারে দশজন করে দড়ী দিয়ে বাঁধা সিপাইকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হতে লাগল। শিখ সৈন্যেরা গুলী করবার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট থানায় বসে সমস্ত তদারক করছিলেন। তার কর্মচারীরা তার চার পাশে বসে সে ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখেছিল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাইরা এদের নিকট দিয়ে যাবার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ও শিখ সৈন্যদের গালি দিতে লাগল। প্রতিবারে দশ জন করে সিপাই প্রাণ দিতে লাগল। এভাবে একশো পঞ্চাশ জন সিপাই যখন মারা গেল, তখন একজন ঘাতক মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সময়ের জন্য বন্ধ রাখবার পর আবার আগেকার মতই কাজ আরম্ভ হোল। দু'শো সাইত্রিশ জন সিপাইকে এভাবে মারা হলে পর একজন কর্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেটকে এসে জানাল যে অবশিষ্ট সিপাইরা প্রাচীরের ভিতরকার ছোট্ট ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। এদের ঐ ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। সংবাদ পেয়ে আমি নিজেই সেখানে গেলাম। ঘরের দুয়ার যখন খোলা হোল, তখন দেখা গেল যে হলওয়েলের বর্ণিত ব্যাপার এখানেও ঘটেছে। ভয়ে শ্রান্তিতে অবসন্নতার অতিরিক্ত গরমে এবং আংশিকভাবে শ্বাসরোধের ফলে ঐ ঘরের পঁয়তাল্লিশ জন সিপাই প্রাণত্যাগ করেছে। স্থানীয় মুর্দাফরাসদের দিয়ে লাশগুলিকে বের করা হোল। থানার একশত গজ দূরে একটি গভীর কুয়ো ছিল। নিহত সিপাইদের লাশগুলি ঐ কুয়োতে ফেলে দেওয়া হোল। কানপুরে যেমন একটি কুয়ো আছে উজনালাতেও তেমনি একটি কুয়ো রইল।

[কুপার লিখিত 'ক্রাইসিস ইন দি পাঞ্জাব']

কুপার তাঁর এ অপূর্ব কৃতিত্বে ইংরাজ জাতির মুখোজ্জ্বল করলেন।

www.pathagar.com

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে এ ব্যাপারে তাঁর সমঝদারের অভাব হয়নি। এজন্য উপরওয়ালাদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। অনেক বড় বড় লোকদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্রও পেয়েছেন।

চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল তাঁকে প্রশংসা জানালেন। প্রধান বিচারপতি রবার্ট মণ্টগোমারি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কুপারকে লিখে পাঠান, যতদিন কুপার সাহেব জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁর টুপীতে জয়চিহ্ন বর্তমান থাকবে। মণ্টগোমারি সাহেব আরও লিখেছিলেন যে লাহোরে তিন রেজিমেণ্ট সিপাইও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদেরও ঠিক এ রকম ব্যবস্থা করাই দরকার।

লাহোরের সিপাইদের মধ্যে চাঞ্চল্য মণ্টগোমারি সাহেবের বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পিছনকার ব্যাপারটা হচ্ছে এই। ঘোড় সওয়ার সিপাইরা যে সমস্ত ঘোড়াগুলিকে ব্যবহার করত, সেগুলি ছিল তাদের নিজেদের সম্পত্তি। নিরস্ত্র করা উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট তাদের নিজেদের ঘোড়াগুলিকে পর্যন্ত নিয়ে নিলেন। এতে সিপাইরা স্বভাবতঃই উত্তেজিত হয়ে উঠল। সিপাইদের এ অন্যায় ব্যবহারে মণ্টগোমারি সাহেব খুবই বিরক্তি বোধ করছিলেন। কুপারের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে তিনি মনে মনে আশা করছিলেন যে উজনালার মতই লাহোরের তিন হাজার সিপাইকেও উৎসন্ন করে দেওয়া যাবে। সমাজের এ জঞ্জালগুলোকে মুক্ত করে সমাজটাকে ভদ্র লোকের বাসযোগ্য করে দিয়ে যাবেন, এ কামনা হয়তো তাঁর মনে মনে ছিল। এ কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারলে তিনিও যতদিন বেঁচে থাকতেন তাঁর টুপীতে জয়চিহ্ন পরে যেতে পারতেন। কিন্তু বিচারপতির জীবনে এ সুযোগ খুবই কম।

কুপারের এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছেন: "কুপারের বর্ণনা থেকে মনে হয় উজনালার অন্ধকূপে জীবিত ব্যক্তিও ছিল। এদের অদৃষ্টে কি ঘটেছিল, তার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। একজন আহত সিপাইকে মহারানীর সাক্ষী স্বরূপ রাখা হয়েছিল।

www.pathagar.com

মণ্টগোমারির অনুরোধে তাকে লাহোর পাঠানো হয়। এর পর আরও একচল্লিশ জন সিপাই ধরা পড়ে। তাদেরও এ সঙ্গেই লাহোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে এদের সবাইকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হোল। এ সকল অসহায়—কর্তৃপক্ষের নিজের ভাষায় 'নিরস্ত্র ভয়বিহ্বল-চিত্ত অনাহারে বিশুষ্ক এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন লোকের ধ্বংস সাধন কোন অপরাধে কোন আইনে হয়েছিল ?"

[মার্টিন লিখিত 'ইণ্ডিয়ান এম্‌ পায়ার ২য় খণ্ড']

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন, এদের ধ্বংসসাধন করা হোল কোন আইনে ?

সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদল দেশের পর দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে, সোনার দেশ লুটেপুটে ছারখার করে দিয়েছে, শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। অজেও করছে।

পৃথিবীর নির্যাতীত মানবতা বার বার এ প্রশ্ন তুলেছে, আজও তুলছে—কোন আইনে ?

এ আইন পশুবলের আইন।

মানব সমাজে এইটাই কি শেষ কথা, এটাই কি শেষ উত্তর ?

না, কখনো না, হতে পারে না। পৃথিবীর অত্যাচারিত জনগণ আজ বুকের রক্ত ঢেলে সেই জবাবের পাল্‌টা জবাব দিচ্ছে। দস্যুদের কথা কখনোই শেষ কথা হতে পারে না।

———

www.pathagar.com

একটি গুপ্তচরের কাহিনী

"প্লাম কেক চাই, প্লাম কেক, বাড়িয়া কেক, তাজা কেক !"

নাইনটি থার্ড হাইল্যাণ্ডার্স এর সার্জেণ্ট ফরবেস মিচেল তার তাঁবুতে সংবাদপত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। কাগজগুলি সদ্য বিলেত থেকে এসেছে। হঠাৎ তার কানে এল,

"প্লাম কেক চাই, প্লাম কেক !"

মিচেল মুখ তুলে কেক বিক্রেতার দিকে তাকালেন। বয়সে তরুণ, দিব্যি সুপুরুষ লোকটি। পরণে পরিষ্কার, ফিটফাট পোষাক। কালো কোঁকড়ানো গোঁফ দাড়ী সযত্নে সজ্জিত। চোখ দুটিতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। পিছনে একটি কুলী প্লাম কেকের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলেছে।

লোকটি তাদের নিজেদের বাজারের কেউ নয়, বাইরে থেকে এসেছে। কাজেই এর সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। যে দিনকাল পড়েছে, কাকেও কি বিশ্বাস আছে ! নাঃ, খবরের কাগজে মায়া ছাড়তেই হোল। সার্জেণ্ট মিচেল জেরা করবার জন্য তৈরী হয়ে বসলেন। তাঁবুর জিম্মাদারী তারই উপরে পড়েছে।

"তাঁবুর মধ্যে যে এসেছ, তোমার সঙ্গে পাশ আছে তো ?" মিচেল প্রশ্ন করলেন।

"আছে বই কি সার্জেণ্ট সা'ব। খোদ ব্রিগেডিয়ার অ্যাড্রিয়ান হোপ সাহেবের দেওয়া পাশ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমার নাম জ্যামি গ্রীণ। আমি—নং রেজিমেণ্টের মেস খানসামা ছিলাম। কানপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরিচয় পত্র নিয়ে আমি উনাওয়ে এসেছি।"

সার্জেণ্ট মিচেল লক্ষ্য করলেন জ্যামি গ্রীণ শুধু চেহারাতেই সুপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত নয়, সে অতি স্বচ্ছন্দে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বলে চলেছে।

জ্যামি তার পাশে বসে বিলাতী কাগজগুলির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিলাতের কাগজওয়ালারা সিপাইদের বিদ্রোহ সম্পর্কে কি লিখছে,,

www.pathagar.com

তা জানবার জন্য তার বিশেষ কৌতূহল দেখা গেল। লক্ষ্ণৌ আক্রমণের জন্য কি রকম প্রস্তুতি চলেছে এবং ইউরোপীয় সৈন্যদের যে নতুন চালান এসে গেছে তারা এ গরম আবহাওয়া কতদূর পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে এ সমস্ত প্রশ্ন করতে লাগল।

মিচেল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন ভাল ইংরাজী বলতে কি করে শিখলে তুমি?"

"আমার আব্বাও একটি ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের মেস খানসামা ছিলেন। সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করবার ফলে ছেলেবেলা থেকেই আমি ইংরাজীতে কথা বলতে পাকা হয়ে উঠেছিলাম। তা ছাড়া রেজিমেণ্টের স্কুলে আমি লেখাপড়া শিখেছি। আমাকে অনেকদিন মেসের রাইটার হিসাবে কাজ করতে হয়েছে, সেখানে হিসাবপত্র ইংরাজীতেই রাখতে হোত।"

ইতিমধ্যে তাঁবুর বাসিন্দারা অনেকেই কেকের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। একজন তো কেক খেয়ে দিব্যি হাত মুখ মুছে বসে আছে একটি পয়সাও বের করতে চায় না। এ নিয়ে জ্যামির কুলীর সঙ্গে তার রীতিমত বচসা বেঁধে উঠল।

ব্যাপার দেখে জ্যামি বলে উঠল—"ঠাট্টা ঠাট্টাই, সে কথা কি আমরা বুঝি না? কিন্তু এক গুচ্ছের কেক খেয়ে নিয়ে শেষে পয়সা দিতে স্রেফ অস্বীকার করে বসা, এ ঠাট্টা তো দেখছি হাইল্যাণ্ডী ঠাট্টা!"

জ্যামির কথায় সবাই হেসে উঠল। যে লোকটা পয়সা দিতে চাইছিল না, তাকে চাপ দিয়ে পয়সা আদায় করিয়ে ছাড়ল।

এর পরেই জ্যামি ও তার লোকটি কেক বিক্রী করবার জন্য অন্য এক তাঁবুতে চলে গেল। যাবার সময় জ্যামি সার্জেণ্ট মিচেলের কাছ থেকে পড়বার জন্য কয়েকটা সংবাদপত্র চেয়ে নিয়ে গেল।

জ্যামির সঙ্গে সার্জেণ্ট মিচেলের প্রথম বারের সাক্ষাৎ এ ভাবেই শেষ হোল।

সে দিনই সন্ধ্যার সময় মিচেল যখন তাঁর ডিউটি দিচ্ছেন, এমন সময় এক চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেল, কেক বিক্রেতা জ্যামি আর তার সে

www.pathagar.com

সঙ্গী দুজনেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। গুপ্তচরের কাজ করবার জন্যই ওদের লক্ষ্ণৌ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মেজর ব্রিগেডিয়ারের অফিসে তাদের জেরা চলেছে। রাত্রি অনেকটা হয়ে গেছে বলে আজ রাত্তিরে আর তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে না। এ রাত্রিটির জন্য তাকে মিচেলের জিম্মায় রাখাই স্থির হয়েছে, এজন্য অতিরিক্ত পাহারা মোতায়েন করা হবে।

খবরটা পেয়ে তার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। গুপ্তচরকে সবাই ঘৃণা করে, দারুণ ঘৃণা করে। তাদের জন্য কারো মনেই দয়া বা অনুকম্পার ভাব থাকে না। তবু কাল যেটুকু আলাপ হয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে লোকটি সম্পর্কে মিচেলের মনে গভীর শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল, আর তার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে একটা উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তাঁর মনের মধ্যে একটা খট্‌কা লেগেছিল যে এ রকম চেহারা ও শিক্ষা যার সে একজন ফিরিওয়ালার সাধারণ কাজে নামতে যাবে কেন। সম্প্রতি এ খবরটা পেয়ে সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

একটু বাদেই কয়েকজন প্রহরী জ্যামি গ্রীনকে মিচেলের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। পরদিন সকাল পর্যন্ত তাকে সেখানে রাখতে হবে। যে লোকটি কেকের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলেছিল, তার নাম মিকি। তাকেও সেখানেই আটক করে রাখা হোল। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কানপুরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড করা হয়েছিল, এ লোকটি নাকি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল।

মিচেলের হাতে বন্দীদের রাত্রির মত সমর্পণ করেই প্রহরীরা ক্ষান্ত হোল না। তারা বাজার থেকে শুয়োরের গোশত আনাবার ব্যবস্থা করতে লাগল। ফাঁসিতে ঝুলাবার আগেই এ গোশত খাইয়ে তাদের ধর্ম নষ্ট করতে হবে। মিচেল তাদের এ কাজে বাধা দিলেন। তিনি প্রহরীদের এ বলে শাসিয়ে দিলেন যে বন্দীদের উপর যদি কোনরকম জুলুম করা হয়, তবে তা কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে না এবং শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে তাদের গ্রেফতার করা হবে।

মিচেলের এ কথায় জ্যামি গ্রীণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে

www.pathagar.com

বলল, "আপনার কাছ থেকে এতটা দয়া আমি আশা করিনি। আল্লাহ্ ও রসুল আপনার মঙ্গল করবেন।"

মিচেল তাদের হাতের বাঁধন খুলে দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুক্তভাবে নামায পড়তে পারে। তাদের জন্য বাজার থেকে ভাল ভাল খানা ও সুগন্ধি তামাক আনিয়ে দেওয়া হোল। জ্যামি গ্রীন পরম আনন্দে তাদের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে মিচেল জ্যামি গ্রীনকে তার নাম ধাম পরিচয় কার্যকলাপ ইত্যাদি খুলে বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। জ্যামি আপত্তি করল না, কম্বল পেতে আরাম করে বসে সে তার জীবনের ইতিহাস বলতে শুরু করলো।

"খোদাকে বহুত শোকরিয়া জানাই যে এমন সহৃদয় এক সাহেবের সঙ্গে তিনি আমার জীবনের শেষ রাত্রিটি কাটাবার সুযোগ দিয়েছেন। সার্জেণ্ট সাহেব, এ আমার কিসমৎ। আপনি আল্লাহ্‌র এ মজলুম বান্দাহ্‌র প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহ্ আপনাকে আখেরে পুরস্কৃত করবেন।"

"আপনি আমার জীবনকাহিনী জানতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন আমি সত্যসত্যই একজন গুপ্তচর কিনা। তবে শুনুন, গুপ্তচর বলতে যাদের বোঝায়, আমি ঠিক সে পর্যায়ের লোক নই। আমি বেগমের বাহিনীর একজন অফিসার, লক্ষ্ণৌর সৈন্য বাহিনীর চীফ ইঞ্জিনিয়ার আমি। আপনাদের সৈন্য সংখ্যা কত, আপনারা সঙ্গে 'সীজ ট্রেন' নিয়ে এসেছেন কি না, আপনাদের সম্পর্কে এ সমস্ত খোঁজখবর নেবার জন্যই লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে দিলেন না। আমার কথা ছিল আজ বিকেলেই ফিরে যাবো। তাহলে কাল সকালে সূর্য উঠবার আগেই আমি লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে পারতাম। যে সমস্ত খবর আমার জানবার ছিল, সবই জানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার কেমন একটা ঝোঁক এসে গেল আর একবার উনাওটা ঘুরে যাই। আপনাদের 'সীজ ট্রেন' আর 'এ্যামিউনিশন পার্ক' লক্ষ্ণৌর পথে চলতে শুরু করেছে কিনা, নিজের চোখে দেখে যাবার জন্য আমি খুবই উৎসুক

www.pathagar.com

হয়ে উঠেছিলাম। ঠিক সে সময়ই আমি এক হতভাগার দৃষ্টিতে পড়ে গেলাম।"

"যে লোকটা আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে, সে প্রথমতঃ ইংরাজদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এখন ফাঁসির হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের সাফাই গাইবার উদ্দেশ্যে তার দেশের ভাইদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক, এ দেশদ্রোহিতার জন্য একদিন তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে। (যে লোকটি জ্যামি গ্রীনকে গুপ্তচর বলে ধরিয়ে দিয়েছিল, পরের বছর মে মাসে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে বেরিলীতে যখন প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন সে তার ইংরাজ প্রভুকে হত্যা করেছিল।)"

"আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছেন, আপনার স্কটল্যাণ্ডের বন্ধুদের কাছে আপনি আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী লিখে জানাতে চান। বেশ তো, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই। লণ্ডন ও এডিনবার্গ শহরে আমাকে দু' দু'বার যেতে হয়েছে। সেখানে আমার কয়েকজন পুরানো বন্ধুও আছেন।"

"আমার নাম মহম্মদ আলী খাঁ। রোহিলখন্দের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমি বেরিলী কলেজ পড়তাম। বেরিলী কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে আমি রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় আমি আমি সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করি। যে সমস্ত ইউরোপীয় ছাত্র সেখানে পড়তেন, তাদের চেয়ে কি সিভিল কি মিলিটারী দুটো বিভাগেই আমি অনেক বেশী ভাল ফল দেখিয়েছিলাম।"

"কিন্তু তাতেই বা লাভ কি হোল! কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে জমাদারের র‍্যাংক্‌এ আমাকে নিয়োগ করা হোল। ফলে আমাকে এমন একজন ইউরোপীয়ান সার্জেণ্টের অধীনে কাজ করতে হোত, যে আমার চেয়ে একমাত্র গায়ের জোর ছাড়া আর সব বিষয়েই হীন ছিল। শিক্ষা বলতে তার প্রায় কিছুই ছিলনা। ইংলণ্ডে থাকলে মিস্ত্রীর চেয়ে উঁচুপদে উঠবার সুযোগ সে কখনোই পেত না। মূর্খ লোকের হাতে ক্ষমতা

www.pathagar.com

পড়লে যা হয়, তার বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে যে সমস্ত দোষ দেখা যায়, তার সবগুলিই তার মধ্যে প্রখর হয়ে ফুটে উঠেছিল। তার গোঁয়ার্তুমী ঔদ্ধত্য আর স্বার্থপরতা আমাদের সব চেয়ে বেশী উত্যক্ত করে তুলত।"

"কেবলমাত্র টাকার লোভে আমি কোম্পানীর চাকুরীতে ঢুকিনি, আশা ছিল একটা সম্মানজনক কাজ পাব। কিন্তু ঢুকেই পেলাম শুধু অপমান আর লাঞ্ছনা। যাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতাম তারই অধীনে তারই হুকুম মেনে আমাকে কাজ করতে হোত। সমস্ত অবস্থা খুলে জানিয়ে বাড়ীতে আব্বার কাছে চিঠি লিখলাম। লিখলাম, মান সম্মান নিয়ে এখানে আর কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আব্বা আমার অবস্থাটা বুঝলেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এস। চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।"

"ভেবেছিলাম অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দিনের সরকারে কাজ নেব। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে এসে পৌঁছতেই শুনি লক্ষ্ণৌ বিরাট সংকটের মুখে। কোম্পানী বাহাদুর লক্ষ্ণৌ শহরের উপর যথেচ্ছ লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছেন। আর তাদের সে মহৎ কাজে সাহায্য করবার জন্য নেপালের জঙ্গ বাহাদুর সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত আছেন। সেখান থেকে তিনি বিলাত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শুনতে পেলাম তাঁর নাকি একজন ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রয়োজন। শুনেই প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদের জন্য দরখাস্ত করে দিলাম। কোন বেগ পেতে হোল না। সঙ্গে সঙ্গেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল।"

"যথাসময়ে এ নতুন চাকুরী নিয়ে মহারাজার সঙ্গে রওনা হ'লাম। এ আমার প্রথম বিলাতযাত্রা। লণ্ডন থেকে যখন এডিনবার্গ গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আপনাদের এ নাইনটি থার্ড হাইল্যাণ্ডার্সই মহারাজার সম্বর্ধনা উপলক্ষে 'গার্ড অব অনার' দেয়। তখন কি একবার স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম যে একদিন হিন্দুস্থানে এ রেজিমেণ্টেরই তাঁবুতে আমাকে মৃত্যু-প্রতীক্ষায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে! নসিবে কি আছে, কেই বা তা বলতে পারে, আর কেই বা তাকে রুখতে পারে!"

www.pathagar.com

"ভারতে ফিরে এসে আমি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত নানা জায়গায় নানা রকমের কাজ করেছি। এ সময় আজিমুল্লাহ্ খাঁ বিলাতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তাব করলেন। আমি সম্মতি জানালাম। বিদ্রোহের প্রসঙ্গে আজিমুল্লাহ খাঁর নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনছেন। পেশোয়ার মৃত্যুর পর নানা সাহেব আজিমুল্লাহ্ খাঁকে তাঁর এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। আজিমুল্লাহ খাঁ ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে খুবই আশাবাদী ছিলেন যে একবার বিলাতে যেতে পারলে নানা সাহেবের মামলাটা তিনি ফতে করে আসতে পারবেনই।"

"আজিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে লণ্ডন গেলাম। পানির মত অজস্র টাকা খরচ করা হোল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমরা গিয়েছিলাম, তাতে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলাম। নানা সাহেবের আপীল টিকল না, লর্ড ডাল হাউসীর রায়ই বহাল রয়ে গেল। বিলাত যাত্রা থেকে শুরু করে কনষ্ট্যান্টিনোপল্‌স্ হয়ে ১৮৫৫ সালে ভারতে ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হয়েছিল।"

"কনষ্ট্যান্টিনোপল্‌স থেকে আমরা রুশ দেশের ক্রিমিয়ায় গেলাম। সেখানে তখন ইংরাজদের সঙ্গে রাশিয়ানদের তুমুল লড়াই চলেছে। ১৮ই জুন তারিখে ইংরাজরা এ যুদ্ধে পরাস্ত হয়। যুদ্ধের দৃশ্য আমরা সেখানে বসেই দেখতে পেয়েছিলাম! সিবাস্তোপলে দুপক্ষের সৈন্যদের চূড়ান্ত দুরবস্থা দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমরা কনষ্ট্যান্টিনোপল্‌সে ফিরে এলাম। এখানে কয়েকজন রুশ এজেন্টের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা আমাদের খুবই ভরসা দিলেন যে আজিমুল্লাহ্ যদি হিন্দুস্তানে কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস করবার জন্য বিদ্রোহের সৃষ্টি করে তুলতে পারে, তা'হলে তাঁরা প্রচুর সামরিক সাহায্য দেবেন।"

"এর পরেই আজিমুল্লাহ্ খাঁ ও আমি কোম্পানীর রাজত্বকে খতম করবার জন্য সারা হিন্দুস্তানব্যাপী বিদ্রোহ সৃষ্টি করে তুলবার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম। শুক্‌র্ খোদা, আমরা সে কাজে কিছুটা সাফল্য

www.pathagar.com

লাভ করেছি। আপনার কাছ থেকে যে খবরের কাগজগুলি আমি নিয়েছি, তার মধ্যে দেখতে পেলাম, কোম্পানীর রাজত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে। এতদিন ধরে কোম্পানী যে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে আসছিল, তা আর চলতে দেওয়া হবে না। ইংরাজের হাত থেকে আমরা আমাদের দেশকে মুক্ত করতে পারিনি, একথা সত্য, তবে হ্যাঁ, কিছুটা ভাল কাজ আমরা করতে পেরেছি। আমি আশা রাখি, আমাদের এ জীবন দান একেবারে ব্যর্থ হবে না। আমি বিশ্বাস করি, কোম্পানীর রাজত্বের চেয়ে পার্লামেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অনেকটা ভাল হবে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের নির্যাতীত ও পদানত দেশবাসীর সম্মুখে এখনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। অবশ্য সে সুন্দর দিনটিকে দেখবার জন্য আমি আর বেঁচে থাকব না।"

মিচেল জিজ্ঞাসা করলেন, "কানপুরে যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, আপনি কি তখন সেখানে ছিলেন?"

"না, শুকর্ খোদা, আমি তখন রোহিলখণ্ডে আমার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে যাদের হত্যা করতে হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কারো রক্তে আমার এ হাত রঞ্জিত হয় নি। যখন বুঝলাম ঝড় উঠবার সময় এসেছে, আমি তখন আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিরাপদ উায়গায় রেখে আসতে গিয়েছিলাম। গ্রামে বসেই আমি মীরাট ও বেরিলীর সংবাদ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিলী ব্রিগেডে যোগ দেবার জন্য চলে গেলাম। সেখান থেকে বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে দিল্লী যাই।"

"দিল্লীতে আমাকে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদ দেওয়া হয়। রুরকী ও মীরাটে কোম্পানীর যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের সাহায্যে আমি দিল্লীর রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললাম। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজেরা দিল্লী পুনরাধিকার করে। সে পর্যন্ত আমি দিল্লীতেই ছিলাম। দিল্লী ছেড়ে আমরা প্রথমতঃ মথুরার দিকে যাত্রা করলাম। যমুনার তীরে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। সেখানে পারাপার করবার জন্য আমি একটি নৌকার পুল তৈরী করলাম। তখনও

www.pathagar.com

আমাদের সঙ্গে ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। শাহজাদা ফিরোজ শাহ ও জেনারেল বখ্‌ত খাঁ তাদের পরিচালিত করছিলেন।"

"লক্ষ্ণৌতে আসবার পর আমি সেখানকার চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হই। নভেম্বর মাসে আপনাদের রেজিমেণ্ট যখন লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সীতে অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈন্যদের সাহায্য করতে গেল, সে পর্যন্ত আমি লক্ষ্ণৌতেই ছিলাম। সেকেন্দাবাগের সে ভীষণ হত্যাকাণ্ড আমি নিজের চোখে দেখেছি। তার আগেকার রাত্রিতেই আমি সেখানকার রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলাম। আপনারা যখন আক্রমণ করলেন আমি তখন শাহ নযীফের উপর দাঁড়িয়ে সব কিছুই দেখছিলাম। যখন দেখলাম, পতাকাদণ্ড থেকে আমাদের সবুজ পতাকা জোর করে টেনে নামানো হচ্ছে, আমার মনে হোল আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে এল। বুঝলাম, আর আশা নেই, সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন আমি শাহ নযীফ থেকে সেকেন্দ্রাবাগের উপর তোপ দাগবার জন্য আদেশ দিলাম।"

"আচ্ছা, কানপুরে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের হত্যা করবার আগে তাদের উপর ধর্ষণ করা হয়েছিল, একথা কি সত্য?" মিচেল প্রশ্ন করলেন।

জ্যামি উত্তর দিল ঃ "সাহেব, আপনারা এদেশে নতুন এসেছেন, এদেশের হালচাল কিছুই প্রায় জানেন না, তাই এ প্রশ্ন করছেন। এদেশের লোকদের আচার বিচার, জাতের কড়াকড়ি সম্পর্কে যারা কিছু জানে, তারাই বুঝতে পারবে যে এটা মনগড়া গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশের লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তুলবার জন্যই এ কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়েছে। কানপুরে স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল, একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কোন মেয়ের উপর ধর্ষণ করা হয় নি। এ রটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি জানি কানপুরের একটি বাড়ীর দেয়ালের গায়ে লেখা ছিল, আমরা এখন বর্বর-দের দয়ার উপরে নির্ভর করে আছি। তারা বৃদ্ধা যুবতী নির্বিশেষে সকলের উপর বলাৎকার করছে। এ লেখাটি প্রথমতঃ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জেনারেল আউটরাম ও হ্যাভেলক কর্তৃক

www.pathagar.com

কানপুর পুনরাধিকারের পর হিন্দুস্থানের লোকদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালাবার উদ্দেশ্যেই এ দুরভিসন্ধিমূলক জাল রচনা তৈরী করা হয়। আমি অবশ্য সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে আলাপ করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচি। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আমি যে কথা বলছি, সেটাই সত্য।"

"নানা সাহেব এ রকম নৃশংস ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের হুকুম দিয়েছিলেন কেন, এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?"

"আমার নিজের ধারণা নানাসাহেবের আগে থেকেই এ ধরণের হীন কাজ করবার পরিকল্পনা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন না। বিবিঘরের এ শোচনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর দুর্বলচিত্ততাই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অন্তঃপুরের একটি শয়তান প্রকৃতির মেয়েমানুষ এ ব্যাপারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী; তা ছাড়া সে সময়ে নানাসাহেবকে ঘেরাও করে এমন কয়েকজন লোক ছিলেন যারা যে কোন ভাবেই হোক এ ধরণের গুরুতর কাজের মধ্যে তাঁকে এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট করে রাখতে চাইতেন, যাতে দুর্বলচিত্ত নানাসাহেব কোন মতেই বিদ্রোহের পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ভাল মানুষ সাজবার সুযোগ না পান। কাজেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সেই শয়তানীকে সাহায্য করবার মত শক্তিশালী হস্ত এর পিছনে ছিল, যার ফলে তার পক্ষে এ হত্যাকাণ্ডের অনুমতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। ৬নং নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিপাইরা, এমন কি নানাসাহেবের নিজস্ব প্রহরীরাও এ জঘন্য কাজ করতে অস্বীকার করল। তখন এ শয়তান মেয়েলোকটা কতগুলো বিবেকহীন ভাড়াটে ঘাতক সংগ্রহ করে এ কাজ সম্পন্ন করে।"

"আমি তাঁতীয়া টোপীর নিজের মুখ থেকে এ কথা শুনেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নানাসাহেবের সঙ্গে তাঁতীয়া টোপীর মনোমালিন্য ঘটেছিল। আমি আপনাকে যা বলছি, তার মধ্যে এতটুকু অসত্য নেই। কানপুরের ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুদের এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের

www.pathagar.com

পিছনে ছিল এই রাক্ষসীর হিংস্র প্রবৃত্তি। সার্জেণ্ট সাহেব, একটা কথা জানবেন, স্ত্রীলোক যখন শয়তান হয়, তার চেয়ে বড় শয়তান আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু সেই দুর্ভাগিনীদের বিরুদ্ধে তার এ ভয়ানক শত্রুতার কারণ কি, সে কথা জানাবার সুযোগ আমার হয় নি।"

এ কাহিনীর শেষ অংশটুকু বর্ণনা করতে গিয়ে সার্জেণ্ট মিচেল বলছেনঃ "আমি আর আমার বন্দী সারারাত্রি ধরে মুখোমুখি বসে এ ভাবে কথা বলে চললাম। কথা বলতে বলতে রাত্রি ভোর হয়ে এলো। হঠাৎ চমকে উঠলাম, ভোরের পাখীগুলি একসঙ্গে কিচির-মিচির করে উঠেছে। আর একটু সময়, তার পরেই সব শেষ!"

"সকাল বেলা আমি তাকে ওজু করবার ও নামায পড়বার ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার বন্দী আমার মেহেরবানীর জন্য আমাকে আবার ধন্যবাদ জানালেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন, তার এ মজলুম বান্দাহ্‌র উপর যে লোক এমন দয়া দেখিয়েছে, তাঁর রহমত যেন তার উপর এমনি ভাবেই বর্ষিত হয়।"

"একবার, শুধু একবার মাত্র তাঁর মধ্যে একটু দুর্বলতার চিহ্ন দেখেছিলাম। রোহিলখন্দের কোন দূর এক প্রান্তে অবস্থিত তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলের কথা বলতে গিয়ে ধরা গলায় তিনি একবার বললেন যে তাদের অভাগা বাপের ভাগ্যে কি ঘটেছে, এ কথাটুকু তারা কোনদিন—কোনদিন জানতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। বললেনঃ "ইংলণ্ডের ইতিহাসের মত ফরাসী দেশের ইতিহাসও আমি পড়েছি! আজিকার এই মুহূর্তে আমি বিপ্লবী বীর ডাণ্টনকে স্মরণ করব। না, আমি কোন দুর্বলতা দেখাব না।"

গল্প শেষ হয়ে এল। মিচেল তাঁর শেষ কথা বলছেনঃ

"সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ পেলাম সূর্যোদয়ের পরেই আমাদের ডিভিশনকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করতে হবে। আমাদের দল থাকবে সবার পিছনে। আমাদের সামনে থাকবে 'সীজ ট্রেন' আর 'এ্যামিউনিশন পার্ক'। আমরা পশ্চাৎভাগ রক্ষা করে চলব।

তাঁবু ছেড়ে আমরা যখন যাত্রা করলাম, তখন সূর্য আকাশের কিছুটা

www.pathagar.com

উপরে উঠেছে। কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌর দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে, তারই ধারে একটা গাছের তলা দিয়ে চলেছি। কেন যেন একবার উপরের দিকে তাকালাম—শিউরে উঠলাম। দেখলাম, আমার ভূতপূর্ব বন্দী আর তার সঙ্গী গাছের শাখায় ফাঁসির দড়ীতে ঝুলছে। দুটি আড়ষ্ট কঠিন মৃতদেহ! আমি চলছি, চলছি, দু'চোখে অশ্রু বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে, সামলাতে পারছি না।"

www.pathagar.com

নাম না জানা বিদেশী বন্ধু

আমরা তোমার নাম জানি না। কোন দিন জানব না। তুমি বৃটিশ জাতির কলঙ্ক। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের চোখে তুমি দেশদ্রোহী। ঘৃণার পাত্র। কিন্তু আমরা তোমার কথা ভুলব কি করে! পরাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধে তুমি জীবন পণ করে সংগ্রাম করেছিলে। সেদিন তোমাকে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল তোমার দেশের ভাইদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী সিপাইরা সেদিন তোমাকে তাদের আপন জন বলেই জেনেছিল। আজ তারই একশো বছর পরে বন্ধু বলে আমরা তোমায় স্মরণ করছি।

সার্জেণ্ট মিচেল সিপাই দুর্গা সিং-এর কাছ থেকে এ কাহিনীটিকে উদ্ধার করেছিলেন। সার্জেণ্ট মিচেল, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার জন্যই আমরা আমাদের এ নাম-না-জানা বিদেশী বন্ধুকে ফিরে পেয়েছি।

বেরিলীতে একজন ইংরাজ অফিসার বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিলেন। সিপাই দুর্গা সিং নাইনটি থার্ড হাইল্যাণ্ডার্স-এর সার্জেণ্ট মিচেলের অনুরোধে এ কাহিনীটি তাঁকে বলেছিলেন।

সিপাই দুর্গা সিং বলছেন ঃ

আমি তাঁর নাম জানতাম। কিন্তু অনেক দিন হয়ে গিয়েছে এখন আর নামটা মনে করতে পারছি না। বেরিলীর সৈন্যদলে তিনি ছিলেন সার্জেণ্ট মেজর। বেরিলীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। দেখতে দেখতে সমস্ত রোহিলখন্দ মুক্ত হয়ে গেল। জয়োন্মত্ত বেরিলী ব্রিগেড দিল্লীর দিকে ছুটল। সাহেবও সেদিন এই বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গেই ছিলেন। তাদের ভাগ্যের সঙ্গেই নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন।

দিল্লীতে আসবার পর বাদশাহ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পদোন্নত করে দেন। সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল বখ্‌ত খাঁ। পদ হিসাবে তাঁর পরেই ছিল সাহেবের স্থান। দিল্লী শহর

www.pathagar.com

অবরোধের সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনিই গোলন্দাজ বাহিনীকে পরিচালিত করে এসেছেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁর মত অভিজ্ঞ আর কেউ ছিল না। সেনানায়ক হিসাবে তিনি যে সাহসিকতার ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন, তা খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিদ্রোহী সিপাইদের হৃদয় তিনি জয় করে নিয়েছিলেন। তারা তাঁকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করত, তাদের এই শ্রদ্ধা শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। দিল্লী শহর অবরোধের সময় প্রতিটি দিন তিনি প্রত্যেকটি ব্যাটারিকে ব্যক্তিগত ভাবে তদারক করতেন। কামানগুলো বসানো সম্পর্কে যদি কোন ভুল ভ্রান্তি বেরিয়ে পড়ত, তবে নিজের হাতে তা' সংশোধন করে দিতেন। তাঁর কাজে কোন ত্রুটি ছিল না।

১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজরা যখন দিল্লী আক্রমণ করল, আমার মনে আছে, শয়তানের মতই দুর্ধর্ষভাবে তিনি লড়াই করেছিলেন। ঘাঁটি থেকে ঘাঁটিতে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়িয়েছেন, সিপাইরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছে, তিনি তখন তাদের ডেকে উৎসাহ দিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন, তাদের সুশৃংখলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তুলেছেন, যেখানে যেখানে হামলা হচ্ছে, সেই সব জায়গায় নতুন সৈন্য যুগিয়ে তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। একটা মানুষ, কিন্তু যেন শতহস্তে কাজ করে চলেছেন। যে দেখেছে, অবাক হয়ে গেছে।

দিল্লী আক্রমণের পর তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকদিন দেখা হয় নি। ইংরাজরা দিল্লী শহর পুনরায় দখল করে নিল। আমরা পরাজিত হয়ে দিল্লী ছেড়ে মথুরায় এসে দাঁড়ালাম। এখানে আবার সাহেবের সঙ্গে দেখা হোল। দেখলাম তিনি যমুনা নদী পারাপার করবার ব্যবস্থা তদারক করতে ব্যস্ত আছেন। এখানে বখ্‌ত্‌ খাঁ ও ফিরোজ শাহের পরিচালনায় ত্রিশ হাজার সিপাই জমায়েত হয়েছিল।

সিপাইরা তাদের সেনাপতিদের চেয়ে সাহেবকেই সম্মান করত বেশী এবং যে কোন নেতার চেয়ে তাঁর আদেশকেই তারা সব চেয়ে বেশী মান্য করে চলত। যমুনা পার হবার পর থেকে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহী ফৌজের সঙ্গেই ছিলেন, এ পর্যন্ত খবর আমি বলতে পারি।

www.pathagar.com

দিল্লীর যুদ্ধে জখম হবার দরুণ সকলের সঙ্গে হেঁটে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। কাজেই আমি দল থেকে খসে পড়তে বাধ্য হলাম এবং পায়ে হেঁটে লক্ষ্ণৌ চলে এলাম। লক্ষ্ণৌ শহর থেকে পরে আমি আমার নিজের গাঁয়ে চলে যাই। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য ক্রমশঃই এগিয়ে আসছিল। তাদের হাতে ধরা পড়লে আমার অব্যাহতি পাবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অবস্থা সংকটাপন্ন বুঝে আমি আর কয়েকজন সিপাই লক্ষ্ণৌ শহরে ফিরে এসে আমাদের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

অনেক দিন সাহেবের দেখা পাই নি। লক্ষ্ণৌর পতনের পর রুইয়ার দুর্গে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হোল। সেখানে সিপাইদের পরিচালনার ভার ছিল তাঁরই উপরে। রুইয়ার রাজা নৃপৎ সিংএর তিনিই ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। ইংরাজরা জেনারেল ওয়ালপোলের মারফৎ রাজা নৃপৎ সিং-এর কাছে সন্ধির শর্ত পাঠাল। সাহেবের চেষ্টার ফলে নৃপৎ সিং এই শর্তাধীন সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর শেষ দেখা পাই অযোধ্যায় নবাবগঞ্জের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে বখত খাঁ নিহত হন এবং বহুসংখ্যক সিপাই তাড়া খেয়ে রাপ্তি নদী পেরিয়ে গিয়ে নেপাল রাজ্যের এলাকায় ঢুকে পড়ে। এখানে এসে সিপাইরা তাদের কাউন্সিলের সভা ডাকে। এই সভায় তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে তারা আর তাদের নেতাদের কথা অনুসরণ করে চলবে না। তখন মহারাণীর ঘোষণা বেরিয়ে গেছে। তারা স্থির করল যে তারা এই ঘোষণার শর্ত অনুসারে ইংরাজদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে।

সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তাদের আত্মসমর্পণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য। তিনি তাদের বললেন, "ওদের কথার উপর ভরসা করে যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর, তাহ'লে ওরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের কুকুরের মত ফাঁসিতে ঝোলাবে, নয়তো কালাপানিতে চালান করবে।"

কিন্তু দিনের পর দিন দুঃখকষ্ট সহ্য করতে করতে সিপাইরা এমন অস্থির ও অধৈর্য হয়ে উঠেছিল যে সাহেবের কথায় এবার আর কোনই কাজ হোল না। এরই মধ্যে এই দলেরই এক সিপাই সংবাদ নিয়ে এল যে, যে সকল সিপাইরা তাদের অফিসারকে হত্যা করেনি তাদের

www.pathagar.com

সবাইকে ক্ষমা করা হচ্ছে। সবাইকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যাবার জন্য অনুমতিপত্র ও পথ খরচ বাবদ দু'টাকা করে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এর পর তাদের আর সামলে রাখা সম্ভবপর হোল না। সিপাইরা সাহেবকে বলল, তারা আর সাহেবের কথামত চলবে না, সব চেয়ে কাছে যেখানেই ইংরাজদের ঘাঁটি মিলবে সেখানে আত্মসমর্পণ করে যে যার গ্রামের দিকে যাত্রা করবে।

একে একে সবাই চলে গেল। শুধু তারাই পড়ে রইল, যাদের অপরাধ এতই গুরুতর যে তাদের ক্ষমা পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। আর বাকী রইলেন সাহেব।

একে একে সবাই যে যার পথে চলে গেল। সাহেব একলা বসে রইলেন। আজ আর কেউ তাঁর কথা শুনবে না। আজ আর কেউ তাঁর দিকে বন্ধু বলে, ভাই বলে হাত বাড়াবে না। সবাই তাঁকে ফেলে চলে গেল। কেউ তাঁর দিকে ফিরে চাইবে না। আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, বন্ধু নেই, যতদিন মৃত্যু তাঁকে মুক্তি না দেয়, ততদিন মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে বুনো পশুর মত বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে।

সাহেবের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পথহারা বালকের মত আপনার কাছে আপনি প্রশ্ন করছিলেন,

"এরা সবাই যে যার ঘরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কোন ঘর নেই, আমার তো কোন দেশ নেই। আমি কোথায় যাব, বল, আমি তবে কোথায় যাব!"

এর পরে দুর্গা সিং আর কোনদিন সাহেবের দেখা পায় নি।

www.pathagar.com

ঝাঁসীর রাণী

১৮৫৪ সালের ১৬ই মার্চ।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর দরবার বসেছে। সমস্ত দরবার প্রতীক্ষায় থম থম করছে। আজই ডালহাউসীর ঘোষণা প্রকাশিত হবে। আজকেই জানা যাবে রাণীর দত্তকপুত্র দামোদরের অধিকার ন্যায্য বলে স্বীকৃত হবে, না কোম্পানী নাগপুর, সাতারা ইত্যাদি রাজ্যের মত ঝাঁসীকেও আত্মসাৎ করে নেবেন।

কোম্পানীর প্রতিনিধি মেজর এলিস দরবার গৃহে এসে ঢুকলেন। তাঁর হাতে সরকারী ঘোষণা।

পর্দার আড়ালে রাণী লক্ষ্মীবাঈ আর বাইরে দরবারের লোকেরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মেজর এলিস ঘোষণা পাঠ করে গেলেন—দত্তক পুত্রের অধিকারের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজ্য-গুলির মতই ঝাঁসীও এখন থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণরের শাসনা-ধীনে চলে যাবে।

ঘোষণা শুনে সমস্ত দরবার স্তব্ধ হয়ে রইল।

শুধু পর্দার পিছন থেকে তেজোদৃপ্ত সংযত দৃঢ়কণ্ঠে একটি কথা শোনা গেল,

মেরী ঝাঁসী দুংগী নহী।

ডালহাউসীর আমলে কত রাজাই তো এ রকম রাজ্য হারিয়েছেন, কিন্তু এমন কথা এমন করে কে বলেছেন! মেজর এলিস চমকে উঠলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈর এই বিখ্যাত উক্তি না জানে কে! আজও ঘরে ঘরে এই কথাটি সুপরিচিত। আজও ঝাঁসীর বুড়োবুড়ীরা পুরাণো দিনের সেই ছড়া আওড়ায়,

www.pathagar.com

বঢ়ি, বঢ়িয়া থে য়ো রাণী
যিননে ঝাঁসী ন ছোড়েঙ্গী বোলী।
যিননে সিপাইয়েঁাকে লিয়ে লড়াই কিয়ে
ঔর আপনি খায়ে গোলী॥

রাণীকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝাঁসীকে ছাড়তেই হোল। ডালহাউসীর ঘোষণা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু যদি তিনি নতমস্তকে এই অবিচার চিরদিন মেনে নিয়ে চলতেন তাহলে কেই বা মনে রাখত তাঁকে আর কেই বা মনে রাখত তাঁর সেই চিরস্মরণীয় 'মেরী ঝাঁসী দুংগী নহী?'

সেই থেকে তিনটি বছর ঘুরে এসেছে।

মাত্র তিনটি বছর, কিন্তু এরই মধ্যে জমানা বদলে গেছে, হাওয়া গেছে উলটে। অবাধ্য ঘোড়া আরোহীকে চীৎপাত করে তার আসন থেকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মত বেগে ছুটে চলেছে। তার ছেঁড়া লাগাম টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে পথের পাশে। আরোহী উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়ছে। ফন্দি আঁটছে মনে মনে আবার কি করে ওকে পাকড়াও করবে।

১৮৫৭ সাল ভারতের ইতিহাসে এক রক্তে রাঙ্গা অধ্যায়।

বিদ্রোহের ঘূর্ণিবায়ুর টানে, ঘটনাস্রোতের দুরন্ত প্রবাহে রাজা, নবাব, জমিদার, তালুকদার, সিপাই, ব্যবসায়ী, কারিগর, চাষী—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এসে জমায়েত হয়েছে একই মোরচায়।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সেই মোরচার সমুখ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিন বছর আগেকার 'মেরী ঝাঁসী দুংগী নহী' আওয়াজ আজ 'খুল্‌ক খোদাকা, মুলক্ পাদশাহ্‌কা, হুক্‌ম নানাসাহেব ফৌজ বাহাদুরকা' আওয়াজের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্বার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ছোট্ট ঝাঁসীর আত্মরক্ষার লড়াই আজ ভারতব্যাপী মহাবিদ্রোহের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

লক্ষ্মীবাঈর ঝাঁসী বিদ্রোহীদের শক্তিশালী প্রতিরোধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ঝাঁসী তখন সমগ্র মধ্যভারতে বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থানের প্রধান সামরিক ঘাঁটি।

www.pathagar.com

আয়ার্ল্যাণ্ড, সিরিয়া, ক্রিমিয়া ও সিবাস্তিপোলের যুদ্ধে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ সেনাপতি হিউরোজের ডাক পড়ল ঝাঁসী আক্রমণ করবার জন্য। বিনা বাধায় ঝাঁসী পর্যন্ত পৌঁছানো গেল না। রাথগড় থেকে ঝাঁসী পর্যন্ত পথে পথে বহুবার তাকে আক্রান্ত হতে হয়েছে। পথে পথে অনেক খণ্ড যুদ্ধের মধ্যে তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এই সমস্ত খণ্ড যুদ্ধগুলিকে ঝাঁসীর যুদ্ধেরই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করা যেতে পারে।

রাথগড়ের যুদ্ধ। পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বিদ্রোহীরা তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে চলল। কিন্তু এ তো যুদ্ধ নয়, এ যে শুধু আত্মবিসর্জ্জন। যোদ্ধাদের মধ্যে সিপাই ছিল কমই। অধিকাংশই সাধারণ চাষী। কাজেই কামান, বন্দুক বনাম তলোয়ার বা বর্শার লড়াইয়ের ফল যা' হতে পারে তাই হোল। তিনদিন পর্যন্ত তারা ইংরাজ সৈন্যদের উদ্ব্যস্ত করে রাখল। তার জন্য তাদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। যুদ্ধে তাদের পক্ষে দুশোর বেশী লোক মারা গিয়েছিল। আর একশো সাতাশ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেন মহম্মদ ফজিল খাঁ। মহম্মদ ফজিল খাঁ ভূপালের বেগমের আত্মীয় ছিলেন। ইংরাজের পরম বন্ধু ভূপালের বেগম সে সময় ইংরাজদের বিপুল অভ্যর্থনা জানান। যুদ্ধে হিউরোজকে তিনি সাত শো সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর এই সৈন্যেরাই মহম্মদ ফজিল খাঁকে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মহম্মদ ফজিল খাঁ, নবাব কামদার খাঁ, কিষেণরাম ও ওয়ালিদাদ খাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বারোদিয়ার প্রতিরোধে ঝাঁসীর রানী ও বানপুরের রাজা যুক্তভাবে পরামর্শ করে যুদ্ধের ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং বারোদিয়ার যুদ্ধে নিজেই নেতৃত্ব করেছিলেন। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পক্ষের অনন্ত সিং ও কাজি মোহাম্মদ খাঁ নিহত হলেন। ডান কাঁধে বন্দুকের গুলীতে জখম হয়ে ঠাকুর মর্দন সিং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রায় পাঁচশো জন লোক মারা গেল। এদের মধ্যে তিনশো জনই ছিল কৃষিজীবি সাধারণ মানুষ। এরা পাথর, তীর, ধনুক ও বর্শা নিয়ে ইংরাজের গুলী রুখতে এগিয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

এই ভাবে রাথগড়ের পর বারোদিয়া, বারোদিয়ার পর খুরই, বানপুর, শাহগড় একটি একটি করে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি হিউরোজের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, এ যেন খালিহাতের লড়াই, তবু তারা বিনাযুদ্ধে হিউরোজকে পথ ছেড়ে দেয়নি।

সমস্ত বুন্দেলখণ্ডের মানুষ আশা করে তাকিয়ে আছে ঝাঁসীর দিকে। বিদ্রোহের প্রাণ-কেন্দ্র ঝাঁসী শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপণ প্রতিরোধ দেবে এ বিষয়ে বুন্দেলীদের মনে কোনই সংশয় নেই। কবি ভূপৎলাল তাঁর কবিতায় তাদের প্রাণের কথা বলেছেন ঃ

"কহত ভূপৎলাল যব্‌তক্ বুন্দেলা শুর রহে জীউ
তব্‌তক্ আংরেজ ক্যায়সে লেবত ঝাঁসী, সবী দেখ লেও।
ঝাঁসী কিল্লা ঔর বাঈসাহেব যব্‌তক্ রহে জীউ
তব্‌তক্ আংরেজ ক্যায়সে লেবত ঝাঁসী হামে দেখ লেও।"

"ভূপৎলাল বলছেন, যতদিন বুন্দেলা বীরেরা জীবিত থাকবে ততদিন দেখে নেব ইংরাজ কি করে ঝাঁসী নিয়ে নেয়! ঝাঁসীর কেল্লা আর বাঈসাহেব যতদিন থাকবেন দেখে নেব ইংরাজ কি করে ঝাঁসী নিয়ে নেয়!"

ব্যক্তিগত সাহস ও শৌর্যই রাণী লক্ষ্মীবাঈর চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট নয়। তার চেয়েও বড় কথা তাঁর দুরদৃষ্টি, তাঁর সংগঠনী ক্ষমতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা। বিদ্রোহের অন্যান্য নেতাদের কারো মধ্যে এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ, হিন্দু ও মুসলমান তাঁর ডাকে সমানভাবে সাড়া দিয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান সিপাইরা তাঁকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আফঘান সৈন্যদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। শেষ দিন পর্যন্ত এই আফঘান সৈন্যেরাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে। পরাজয় ও চরম দুর্দশার দিনেও তাঁকে ছেড়ে যায় নি। বাঈ-সাহেবকে রক্ষা করবার জন্য তারা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে।

"তাঁর প্রজাসাধারণের উপর তিনি এক বিরাট প্রতিপত্তি অর্জন করে-ছিলেন। এই প্রতিপত্তি এবং চরিত্রের এই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেরণাসঞ্চারী শৌর্যের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হয়েছিল তাঁর মধ্যে। তারই ফলে

www.pathagar.com

হিউরোজের সৈন্যদের তিনি এমন প্রতিরোধ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কোন সেনাপতির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলে সার্থক হতে পারত।"

২৩শে মার্চ থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ২৩শে থেকে ২৯শে, এই কয়দিন ধরে যুদ্ধ চলল। দুই পক্ষের গোলন্দাজরা অজস্রধারায় অগ্নি ও মৃত্যু বর্ষণ করে চলল। ইংরাজের গোলায় নগরের যেখানে ঘনবসতি সেখানেই আগুন জ্বলে উঠতে লাগল। এদিকে ঝাঁসীর গোলন্দাজদের নেতা গোলাম ঘোঁসের গোলায় শঙ্করমন্দির ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। এই-খানেই ইংরাজরা তাদের নতুন ব্যাটারী বসিয়েছিল।

২৯শে মার্চ ঝাঁসীর দুর্দিন দেখা দিল। একই দিনে গোলন্দাজদের নেতা গোলাম ঘোঁস ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য খুদাবক্স খাঁ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে রাণীর চোখে অশ্রু দেখা দিল। সমস্ত ঝাঁসীবাসীর মুখে কালো ছায়া নেমে এল।

"কেল্লার ভিতরে বীরের সম্মানে গোলাম ঘোঁস ও খুদাবক্সকে সমাহিত করা হোল। কেল্লার চতুরা মহলের দক্ষিণ কোনে আজও সেই সমাধি রয়েছে। ২৯শে মার্চ তার জিয়ারৎ হয় আর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়। ঝাঁসীর মানুষ আজও সেখানে এসে এই দুই বীর সৈনিককে শ্রদ্ধা জানায়।

[মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য রচিত 'ঝাঁসীর রাণী']

যুদ্ধ চলল। আঘাতের পর আঘাতে ঝাঁসীর কেল্লা থরথর করে কেঁপে উঠতে লাগল। শেষ পরিণতির দিন এগিয়ে এসেছে। তবু তারা মৃত্যু পণ করে লড়াই করে যেতে লাগল। ইংরাজ ঐতিহাসিক এইচ রোজ লিখছেন ঃ

"বহুজন অপারগ, বহুজন নিহত ও আহত, তবুও শত্রুরা যুদ্ধ করে চলেছে।"

শেষ পর্যন্ত আর ঠেকিয়ে রাখতে পারা গেল না ; ২রা এপ্রিল শেষ রাত্রিতে ইংরাজ সৈন্যেরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করল। রাজপথের উপরে, প্রতিটি বাড়ীর মধ্যে সিপাই ও নাগরিকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। চল্লিশ জন আফঘান রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। মরবার আগে

www.pathagar.com

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা লড়াই করে গিয়েছিল। হিউরোজ তার মিলিটারী ডেসপ্যাচে লিখে গিয়েছেন ঃ

"তাদের দেহ অর্ধদগ্ধ। কাপড়ে আগুন জ্বলছে। সেই অবস্থায় তারা ছুটে বেরিয়ে এল। দুই হাতে দুই তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ কারীদের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুলী বা সঙ্গিনের আঘাতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়াই বন্ধ করেনি। মরতে মরতেও তারা লড়াই করেছে।"

চারিদিকে শত্রুসৈন্য ঘেরাও করে আছে। তারই মধ্য দিয়ে রাণী আর তাঁর সঙ্গী চারশো আফঘান সৈন্য কি করে কেল্লা ছেড়ে পালালেন সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। রাণী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিয়েছেন তাঁর আদরের ধন বালক দামোদরকে।

রাণী পলাতকা, এই সংবাদ যখন হিউরোজের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু রাণী তখন বহু দূরে। এবার শুরু হোল দারুণ প্রতিহিংসার পালা। প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার লো বলেছেন ঃ

"মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্‌কাগতিতে। একটি মানুষকেও রেহাই দেওয়া হোল না। রাস্তাগুলিতে রক্তস্রোত বইতে শুরু করল।"

সমস্ত নগরে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চলতে লাগল। হিউরোজ নিজেই সে সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এই একটি কথাতেই বোঝা যায় যে একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। নগরীর আশে পাশের বন, বাগান, রাস্তা বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপূর্ণ হল। বিদ্রোহী সৈন্যেরা সাধারণতঃ জাতিতে আফঘান ও পাঠান।"

"তখন যে তাণ্ডবলীলা শুরু হোল, তাতে আতংকগ্রস্ত হয়ে ধর্মহানির ভয়ে মেয়েরা শিশুদের কোলে নিয়ে প্রাসাদের কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। প্রত্যক্ষদর্শী কেশব ভাস্করের চোখের সামনে কতজন যে এই ভাবে প্রাণ হারালেন, তা বলা যায় না। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে ইংরাজ সৈন্যেরা বা তাদের দেশী সৈন্যেরা মেয়েদের গায়ে হাত দেয় নি। কিন্তু কেশব ভাস্কর বলছেন, 'সৈন্যেরা মেয়েদের হাত,

www.pathagar.com

কান, গলা, নাক থেকে গহনা ছিঁড়ে নিচ্ছিল এবং বেয়নেট উঁচিয়ে তাড়া করছিল।' ইংরাজেরা মেয়েদের সম্মান রক্ষা করেছে বলে গর্ব করে থাকে। ঝাঁসী ও অন্যত্র তারা যে মেয়ে ও শিশুদের যথেচ্ছ হত্যা করেছিল, তার প্রমাণ আছে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের কাগজে। ইতিহাসে সে কথা কিন্তু তারা লেখেনি। বারো বছর থেকে পঞ্চাশ বছর অবধি সমস্ত পুরুষ ও বালকদের প্রত্যহ হাজারে হাজারে ধরে এনে রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত অঙ্গনে দাঁড় করিয়ে মাথা কেটে ফেলা হোত।"

"ঝাঁসীর আশে পাশের গ্রামবাসীরাও যে রাণীর প্রতিরোধ সংগ্রামে সাহায্য করেছিল, তা হ্যামিল্‌টন ও হিউরোজ ভাল করেই জানতেন। নিত্যই তাদের বন্দী করা হোত। নিত্যই তাদের ধরে আনা হোত ঝাঁসীর কেল্লার বাইরের মাঠে। বিচারের পর ফাঁসি হোত তাদের। দিবারাত্রি বন্দীরা আসছে, বিচার হচ্ছে এবং হুকুম আসছে—লটকাও, লটকাও।"

"ঝাঁসী শহরে রানীর সমস্ত সৈন্য এবং বহুলাংশে নাগরিকরাও নিহত হোল। সমস্ত নগরীর পথে কর্দমাক্ত রক্ত জমে রইল। শকুনী উড়তে লাগল সমৃদ্ধ নগরীর আকাশে। হিউরোজের কঠিন নিষেধ ছিল ভারতীয়েরা কোনমতেই যেন তাদের শবদেহের সৎকার করতে না পারে। সাতই এপ্রিলের পর সমস্ত নগরী যখন পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, গলিত শবদেহের লোভে শৃগাল ও শকুনী বিচরণ করতে লাগল, তখন হিউরোজ আদেশ দিলেন, এবার শবদেহের সৎকার করা যেতে পারে।"

[মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য রচিত 'ঝাঁসীর রাণী']

পরিব্রাজক বিষ্ণুভট্ট গোডসে সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লেখায় সে সময়কার ঝাঁসীর প্রকৃত রূপটি ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেন ঃ

"সমস্ত শহরকে প্রেতভূমি ও মহাশ্মশান বলে বোধ হল। জ্বলন্ত বাড়ীগুলি থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা ঊর্ধে উঠে রাত্রির আকাশকে ভয়াল করে তুলল। আগুন ও বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে আর্ত নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠল। প্রিয়জনের মৃতদেহের পাশে বসে রমনী কাঁদছেন আর তাঁর সামনে বেয়নেট ঠুকে গোরা সিপাই অলংকার খুলে দিতে বলছে।

www.pathagar.com

দীন দরিদ্র, ধনীর ঘরনী, শ্রেষ্ঠির শিশুপুত্র সবাই একসঙ্গে একমুষ্টি অন্ন চেয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে ফিরছে। কোথাও বালকপুত্রের মৃতদেহ নিয়ে মা শোকে বিহ্বল। কোথাও পিতার দেহের পাশে বসে শিশু পুত্র ছোট ছোট হাতে পিতাকে আঘাত করে ডাকছে। হালোয়াইপুরার জলন্ত অট্টালিকার কাঠের বরগাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে ছাই আর গলিত শবদেহের তীব্র গন্ধ।"

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতে ঝাঁসী অধিকার করবার পর ঝাঁসীতে কম পক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রমাণাদি থেকে মনে হয় সংখ্যাটা খুবই কম করে ধরা হয়েছে।

রাণী লক্ষীবাঈ সমস্ত রাত্রি ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। ঝাঁসী থেকে ভাণ্ডীর একশো মাইল পথ। তাঁর সঙ্গে আছে বিশ্বস্ত চারশো আফঘান সৈন্য, যারা বাঈসাহেবের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে চলেছে, শেষ লোকটি পর্যন্ত। পিছন পিছন মেজর ফরবেস ও ক্যাপটেন রবিনসনের নেতৃত্বে তিন দল ঘোড়সওয়ার কামান নিয়ে ছুটে আসছে। জীবিত কি মৃত যে কোন অবস্থায় রাণীকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

সারা রাত্রি ঘোড়া ছুটিয়ে ভাণ্ডীরে এসে সবেমাত্র বসেছেন, অমনি খবর পাওয়া গেল, শত্রু এসে পড়েছে, বিশ্রামের সময় নেই। আফঘান সৈন্যদের সর্দার এসে জানালেন, আপনারা কালপির দিকে চলে যান, আমরা এগিয়ে গিয়ে ইংরাজ সৈন্যকে ঠেকিয়ে রাখি।

আফঘান সৈন্যেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ইংরাজ সৈন্যদের বাধা দিতে লাগল। এই খণ্ড যুদ্ধগুলিতে চারশো আফঘান সৈন্যের মধ্যে আড়াইশো সৈন্য প্রাণ দেয়। আফঘান সৈন্যেরা এভাবে আত্মদান না করলে সেদিন রাণীর রক্ষা পাবার কোনই আশা ছিল না।

লেফটেনাণ্ট ডাওকার দুশো সওয়ার নিয়ে রাণীর পিছন পিছন ছুটে-ছিলেন। ভাণ্ডীর ছাড়িয়ে কালপি রোডের উপর রাণীর সঙ্গে তার দেখা হয়। তখন রাণীর সঙ্গে ছিলেন রঘুনাথ সিং, গুল মুহম্মদ আর রাণীর দুই সহচরী মান্দার ও কাশী। আর ছিলেন দশজন আফঘান সৈন্য। এখানে ডাওকারের সঙ্গে রাণীর মুখোমুখী লড়াই হয়। রাণীর তলোয়ারের

www.pathagar.com

চোট খেয়ে ডাওকার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। রাণীও সেই সুযোগে নিজের পথ দেখলেন। এ সম্বন্ধে ডাওকার পরে বলেছিলেন যে সেদিন তার কোমরে ঝোলানো রিভলবারের উপর তলোয়ারের চোটটা পড়েছিল বলেই তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, তা না হলে তাকে সেদিন দুটুকরো হয়ে যেতে হোত।

এই বিপদসংকুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাণী লক্ষ্মীবাঈ অবশেষে কালপিতে এসে পৌঁছলেন। ওদিকে হিউরোজের সৈন্যবাহিনী কালপি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। স্থির হোল কুঁচে গিয়ে তাদের বাধা দিতে হবে।

৬ই এপ্রিল কুঁচের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে রাণী ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ আর তাঁতীয়া টোপী তাঁর সহকারী। হিউরোজের প্রবল আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হোল না। একদিন যুদ্ধের পর রাণী পশ্চাদপসরণ করে কালপিতে ফিরে এলেন।

এর পর কালপিতে প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তোলা হোল। বুন্দেল-খণ্ডের বিদ্রোহী নেতারা নিজ নিজ শক্তি নিয়ে এখানে এসে জমায়েত হলেন। রাওসাহেব এবার সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। বান্দার নবাব দক্ষিণে রইলেন, পশ্চিমে রইলেন বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং ও শাহগড়ের রাজা বখতব আলী। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহী সিপাইরা শহর ও কেল্লা রক্ষার কাজে নিয়োজিত রইল। আর কালপির উত্তর প্রান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে রইলেন রাণী।

এই প্রবল ও নির্মম শত্রুকে প্রতিরোধ করবার জন্য কালপিতে সে দিন কি রকম প্রস্তুতি ছিল, তার অনেক কিছুই আমরা জানি না। কিন্তু কবির গানের মধ্যে একটি কথা আজও রয়েছে, যার উল্লেখ না করে পারা যায় না। ঝাঁসীর পতনের পর ইংরাজরা ঝাঁসীর অধিবাসীদের উপর যে হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছিল, রাণী তার কিছুটা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিছুটা বা কানে শুনেছেন। কালপিতে এসে তিনি সে কথা ভুলতে পারেন নি। কবির গানে তাই দেখতে পাই,

"পেড় গিরবাও কহত রাণী ঝাঁসী।
ন তেলেঙ্গা দেব হানৈ সিপাহীক ফাঁসী॥

www.pathagar.com

বেহিম্মতসে ন কহ পাওয়ে লটকাও।
ন ধুপ অধুপ মেলি মিলবত ছাঁব ॥"

ঝাঁসীর রাণী বললেন—"গাছ কেটে ফেল, যাতে তেলেঙ্গা আমার সিপাইদের ফাঁসি দিতে না পারে। বে-হিম্মত (ইংরাজ) যেন 'লটকাও লটকাও' না বলতে পারে। প্রখর রোদে যেন তাদের ছায়া না মেলে।"

তিনদিন যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হোল। কালপির শহর ও কেল্লা ইংরাজ সৈন্যেরা দখল করে নিল।

রাণী লক্ষ্মীবাঈকে আমরা শেষবারের মত দেখতে পাই গোয়ালিয়রের যুদ্ধে। সমগ্র কোটাহ-কি-সরাই রক্ষার দায়িত্ব রাণীর উপর পড়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিটিকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে দশ হাজার সৈন্যের পরিচালনার ভার নিতে হয়েছিল। ১৭ই জুন তারিখে গোয়ালিয়রের যুদ্ধ হয়। সমস্ত দিন ধরে প্রবল যুদ্ধ চলল। এই যুদ্ধে দুই পক্ষের যোদ্ধারাই যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশের উচ্চতর সামরিক সংগঠনই সাফল্য লাভ করল।

যুদ্ধ করতে করতে রাণী, মান্দার, রঘুনাথ সিং ও আরও কয়েকজন সৈন্য একটু দূরে সরে এসে পড়ছিলেন। ঠিক সেই সময় একদল ইংরাজ সৈন্য তাঁদের উপর এসে ঝাপিয়ে পড়ল। তাঁরা মূল বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আর রক্ষা নেই!

ছুটাও, ঘোড়া ছুটাও, যত জোরে পার, যত দূরে পার! মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা, গায়ে-গায়ে-ঘেঁসা তীব্র কঠিন প্রতিযোগিতা। পিছন থেকে যারা ধাওয়া করে আসছে, তাদের এড়িয়ে যেতে হবে। রাণীর ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটছে, তার খুরে খুরে আগুনের কণা ঠিকরে উঠছে। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শোনা গেল। রাণী পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন, তাঁর চিরদিনের সহচরী মান্দার গুলীতে আহত হয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তার অন্তিম উক্তি শোনা গেল—বাঈ সাহেব, চললাম।

দাঁড়াবার সময় নেই, ছুটাও, ঘোড়া ছুটাও, যত জোরে পার, যত দূরে পার! একটা গুলী রাণীর গায়ে এসে বিঁধল, পিছন থেকে একটা তলোয়ারের চোট এসে পড়ল তাঁর কাঁধের উপর। দাঁড়াবার সময় নেই, ছুটাও,

www.pathagar.com

ঘোড়া ছুটাও। রাণী ঘোড়ার পিঠের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। রক্তের ধারা তাঁর গা বেয়ে, ঘোড়ার গা বেয়ে পথের মাটি লাল করে তুলল।

শত্রুরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পায় নি। রাণীর সহচরেরা খোঁজ করতে করতে ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেল। সবাই তাঁকে ধরাধরি করে ঘোড়া থেকে নামাল। রাণী একবার চোখ মেলে তাকালেন, স্থির শান্ত-ভাবে যা তাঁর বক্তব্য ছিল বলে দিলেন, তারপর আবার চোখ বুঁজলেন, চিরদিনের জন্য চোখ বুঁজলেন।

পরাধীন ভারতের বুকে এই আগুনের ফুলটিকে ফুটিয়ে তুলল কে? বিদ্রোহ। একমাত্র বিদ্রোহের পক্ষেই সম্ভব।

www.pathagar.com

উজীর আলী নকী খাঁ

অযোধ্যার রাজ্যহারা নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ কলকাতার মুচিখোলায় তাঁর নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। ওদিকে বেগম হযরত মহল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব নিয়ে অযোধ্যায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে স্বদেশ থেকে বহুদূরে, স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওয়াজিদ আলী খাঁর জীবন-সায়াহ্নের শেষ দিনগুলি অতীতের ঐশ্বর্য ও সুখ স্মৃতির রোমন্থনের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে।

নবাবের উজীর আলী নকী খাঁ অদ্ভুত করিৎকর্মা ধুরন্ধর লোক! বাইরে থেকে দেখলে কেউ তাঁর ভিতরের রহস্য বুঝতে পারে না। উজীর সাহেব দিলখোলা খোস মেজাজের লোক। খান, দান, ফুর্তি করেন, মজা লোটেন, ইয়ার বন্ধুরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

কিন্তু ক'জন জানে তাঁর গোপন কথা! সরকারের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছেন। এই ফিরিঙ্গীদের শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম নেই, তাঁর প্রাণে শান্তি নেই। ইঁদুরের মত নিঃশব্দে তিনি গর্ত খুঁড়ে চলেছেন। এই গর্তে বৃটিশ-শাহীকে কবর দিতে হবে।

আলী নকী খাঁর গুপ্ত প্রচারকের দল ফকীর, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, ভিক্ষুক, ফিরিওয়ালার ছদ্মবেশ ধরে সিপাইদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রাজদ্রোহের প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সবাইকে প্রস্তুত করে তুলছে সেই নির্দিষ্ট দিনটির জন্য, যখন সারা দেশের সিপাইরা একই সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, ফিরিঙ্গীদের শাসনের বুনিয়াদকে ভেঙ্গে বরবাদ করে দেবে।

সিপাইদের মধ্যে যে সমস্ত দেশী অফিসার ছিলেন, আলী নকী খাঁ তাঁদের সঙ্গে গোপনে চিঠিপত্র চলাচল করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের আহ্বান জানালেন এই বিদ্রোহে শরীক হবার জন্য—

www.pathagar.com

"কোম্পানীর রাজত্বে কি লাভ হয়েছে আপনাদের? সুযোগ সুবিধা, মান, সম্মান, সমস্তই তো ওই ফিরিঙ্গী অফিসারদের একচেটিয়া। ওদের সবাইকে দিয়ে থুয়ে, ক্ষুদ কুড়া যেটুকু বাকী থাকে, আপনাদের বরাতে শুধু সেইটুকুই মিলতে পারে। আর ওরা কি আপনাদের মানুষ বলে মনে করে! আমাদের দেশ যেদিন আমাদের হাতে ফিরে আসবে সেইদিনই আপনারা আপনাদের উপযুক্ত মর্যাদা পেতে পারবেন, তার আগে নয়।"

এই আহ্বানে দেশী অফিসারেরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাংলাদেশের সিপাইরা অনেকেই অযোধ্যা প্রদেশের লোক। নবাবের হাত থেকে অযোধ্যা কেড়ে নেবার ফলে কি মুসলমান, কি হিন্দু সকলের মনেই দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ডালহাউসী যেদিন অযোধ্যা গ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেদিন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে ভবিষ্যতে তার এই নীতি একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে কি প্রচণ্ড আঘাতই না দেবে!

আলী নকী খাঁ মানুষের মনের কথা বুঝতে পেরে ঠিক সেই জায়গাটিতেই আঘাত করলেন। ইংরাজ দস্যুরা কি ভাবে অযোধ্যা দখল করে নিয়েছিল, তাঁর প্রচারকের দল সিপাইদের মধ্যে সেই কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করে চলল। ইংরাজদের হাতে নবাব পরিবারকে কি নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, কি ভাবে বলপ্রয়োগ করে বেগমদের প্রাসাদ থেকে বের করে দেওয়া হয়, একটির পর একটি করুণ চিত্র যখন তাদের সামনে তুলে ধরা হতে লাগল, অনেক বীরহৃদয় সিপাইও তখন চোখের পানি না ফেলে পারেনি।

মুসলমান অফিসারেরা কোরআন ছুঁয়ে এবং হিন্দু অফিসারেরা গঙ্গার পানি ছুঁয়ে শপথ করল যে এই হারমাদ কোম্পানীর রাজত্বকে খতম না করে তারা নিবৃত্ত হবেনা। এই ভাবে সুবাদারা মেজর সুবাদার, জমাদার ও অন্যান্য দেশী অফিসারেরা যখন পক্ষে চলে আসতে লাগল, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল সিপাইরা বিদ্রোহের পক্ষেই থাকবে।

উজির আলী নকি খাঁ এইভাবে সুকৌশলে বাংলার সিপাইদের মন

www.pathagar.com

জয় করে নিচ্ছিলেন। তাঁর প্রচারকেরা কলকাতার কেল্লার মধ্যেও তাদের গোপন হস্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল। জুন মাসে কলকাতায় একটা জনরব ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অনুচরদল কলকাতার দুর্গের মুসলমান সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে উজীর আলী নকী খাঁর প্রধান কর্ম-কেন্দ্র ছিল ব্যারাকপুর। এখানকার সিপাইরা সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে পারলে সাময়িক ভাবে হলেও কলকাতা ইংরাজদের হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশী। সেই জন্যই কলকাতার ইউরোপিয়ানরা ব্যারাকপুরের কথা মনে করে আতংকে ঘুমোতে পারতেন না।

মে মাসের শেষ ভাগে ব্যারাকপুরের সিপাইরা হঠাৎ নতুন এক কৌশল গ্রহণ করল। মনে হয় আলী নকী খাঁর কৌশলী হাত এর পিছনে ছিল।

ব্যারাকপুরের সিপাইরা হঠাৎ সবাই রাজভক্ত বনে গেল। তারা বলল, আমরা কোম্পানীর নিমক খাই, কোম্পানীর জন্য জান দিতে আমরা রাজী। যে সব সিপাই কোম্পানীর সঙ্গে বেইমানী করে বিদ্রোহ করেছে, তারা আমাদের দুশমন। আমাদের দিল্লী পাঠানো হোক, ওদের ভাগিয়ে দিয়ে আবার আমরা দিল্লীতে কোম্পানীর রাজত্ব বসাব। তবে আমরা শান্তি পাব।

ব্যারাকপুরের সিপাইদের এই অদ্ভুত রাজভক্তির পরিচয় পেয়ে কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত হলেন। একমাত্র শিখ সৈন্য ছাড়া এ রকম আনুগত্য সে সময় আর কোন অঞ্চল থেকেই প্রত্যাশা করা যেত না।

এই সংবাদ পেয়ে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নিজে এত উৎসাহিত বোধ করলেন যে সিপাইদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি নিজে ব্যারাক-পুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সত্তর নম্বর রেজিমেণ্টের দৃষ্টান্তে তেতাল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্টের সিপাইরা জানাল যে তারাও বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে দিল্লী যাবার জন্য তৈরী আছে।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সিপাইরা গভর্ণমেণ্টের কাছে এনফিলড রাইফেলের জন্য প্রার্থনা জানালো। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, যে বন্দুকের

www.pathagar.com

টোটা নিয়ে সমস্ত গোলযোগের শুরু, সিপাইরা কি না সেই বন্দুকই চেয়ে বসল। সত্তর নম্বর রেজিমেণ্টের একজন অফিসার সুস্পষ্টভাবে তাঁর আবেদন জানালেন ঃ

"আমরা এই বিষয়ে বিবেচনা করে দেখেছি। এখন আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করছি। যে রাইফেল নিয়ে সমস্ত দেশে এতদিন এত গোলমাল চলেছে, আমরা সেই রাইফেল পাবার জন্যই প্রার্থনা করছি। এই রাইফেল ব্যবহার করে আমরা গভর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারব এবং যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, তাদেরও বোঝাতে পারব যে এই রাইফেলের ব্যবহারে আপত্তির কোনই কারণ নেই। তা নইলে আমরাই বা কি করে এই রাইফেল ব্যবহার করি! আমরা কি জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে সচেতন নই।"

গভর্ণমেণ্ট এবার তার রাজভক্ত সিপাইদের নিয়ে উভয় সংকটে পড়লেন। সিপাইরা যদি রাজভক্তির ভান করে, এই উৎকৃষ্ট বন্দুক হস্তগত করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে চলে যায়, তাহলে অশেষ বিপদ। আর তাদের আবেদন পূর্ণ না করলে তারা বুঝবে যে, গভর্ণমেণ্ট তাদের সন্দেহের চোখে দেখছেন; তার ফলে তারাও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

এ পর্যন্ত অভিনয় বেশ ভালই চলছিল। হঠাৎ একটা বেকায়দা ঘটে গেল। ব্যারাকপুরের সিপাইদের কতগুলি চিঠি ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেই সব চিঠিতে কিছু কিছু গোপন খবর ফাঁস হয়ে যায়।

সুবাদার মাদার খাঁ, সরদার খাঁ ও রামশাহীলাল লিখছেন—"বিশ্বাস-ঘাতকতা করার ব্যাপারে শালা ফিরিঙ্গীদের জুড়ী আর কেউ নেই। অযোধ্যার নবাব রাজ্য ছেড়ে দিলেন, কিন্তু ব্যাটারা তাকে পেনসনটা পর্যন্ত দিল না।"

আর একটা চিঠিতে খবর ছিল—"সেকেণ্ড গ্রেনাডিয়ার বলেছেন, সমস্ত রেজিমেণ্ট নবাবের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত আছে।"

চিঠির মধ্য দিয়ে আসন্ন বিদ্রোহের প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস হয়ে গেল। জেনারেল হিয়ার্সে ১৩ই জুন তারিখে গভর্ণর জেনারেলের কাছে জরুরী সংবাদ পাঠালেন যে ব্যারাকপুরের সিপাইরা সেই রাত্রিতেই বিদ্রোহ করবার ষড়যন্ত্র করেছে। কাজেই অবিলম্বে তাদের নিরস্ত্র করা দরকার।

www.pathagar.com

জেনারেল হিয়ার্সের কাছ থেকে এরকম মারাত্মক সংবাদ পেয়ে লর্ড ক্যানিং এবিষয়ে আর ইতস্ততঃ করা সঙ্গত মনে করলেন না। পর দিন ভোর বেলায় দুই দল গোরা সৈন্য ব্যারাকপুরে গিয়ে পৌঁছল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সিপাইদের প্যারেডের ময়দানে জমায়েত করা হোল। সিপাইরা কর্তৃপক্ষের এ সমস্ত আয়োজন কিছুই জানতে পারেনি। ময়দানে হাজির হয়ে চমকে উঠল। তাদের মুখের সামনে কামানগুলো সাজানো রয়েছে। পাশেই সশস্ত্র গোরা সৈন্যেরা প্রস্তুত হয়ে আদেশের অপেক্ষা করছে। জেনারেল হিয়ার্সে সিপাইদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য আদেশ করলেন। বেচারী সিপাইরা কি করবে। গত্যন্তর না দেখে নিঃশব্দে হাতের অস্ত্র নামিয়ে রাখল।

ব্যারাকপুরের সিপাইদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা এই ভাবে ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়ল। গভর্ণমেণ্ট একটা বিরাট ধাক্কা সামলে উঠল। কিন্তু কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজে তার প্রতিক্রিয়া যা ঘটল, তা ভোলার নয়।

মুখে মুখে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত কলকাতায় প্রচার হয়ে গিয়েছিল ব্যারাকপুরের সিপাইরা ১৩ই জুন রাত্রিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এখন তারা দলবদ্ধ হয়ে কলকাতার উপর হামলা করবার জন্য এগিয়ে আসছে। আরও একটা জনরব শোনা যাচ্ছিল যে, নির্বাসিত অযোধ্যার নবাবের অনুচরেরা সিপাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হবার জন্য উদ্যোগ করেছে। এবার আর কারুর রক্ষা নাই!

কলকাতার ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় লোকেরা সকলেই প্রাণের ভয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে আত্মগোপন করবার জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজতে লাগল। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরা ভয়ে আত্মহারা হয়ে দলে দলে চৌরঙ্গী থেকে গড়ের মাঠের দিকে ছুটে চলল। তারা কেল্লার দুয়ারে গিয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগল। নগরের কোন কোন অংশের প্রশস্ত পথ গাড়ীতে পূর্ণ হয়ে গেল। ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে কোন দিকে দৃকপাত না করে পালাবার জন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠতে লাগল। গড়ের মাঠে জনস্রোত বয়ে গেল। ওদিকে গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য। পলায়নকারীরা হয় কেল্লায় নয় তো গঙ্গার উপরে যে সমস্ত জাহাজ ছিল,

www.pathagar.com

সেখানে অশ্রায় লাভের জন্য চেষ্টা করছিল। যে দিকেই চাওয়া যায় সেদিকেই ত্রাসের চিহ্ন। কে কার আগে, কোথায় প্রাণ নিয়ে পালাবে, সকলের মধ্যে তাই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলেছে।

সোমবার দিন প্রকৃত খবর যখন জানা গেল, তখন শহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। ব্যারাকপুরের ঘটনার পরে গভর্ণমেণ্ট নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ, তাঁর উজীর আলী নকী খাঁ ও অন্যান্য কর্মচারী-দের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। ব্যারাকে-পুরের সিপাইদের চিঠিপত্র ছাড়াও আরও কিছু কিছু সংবাদ তাদের কানে এসে পৌঁছেছিল। গভর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে আর ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না, অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ, তাঁর প্রধান উজীর আলী নকী খাঁ ও অন্য তিনজন কর্মচারীকে আটক করে রাখা হবে।

এই কাজের ভার পড়ল পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী এডমনষ্টোন সাহেবের উপর। তিনি গোরা সৈন্য ও পুলিশ প্রহরীদের নিয়ে ভোর বেলা মুচিখোলায় নবাবের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সৈন্যেরা সমস্ত বাড়ী ঘেরাও করল। এডমনষ্টোন সাহেব কয়েক জন সৈন্য নিয়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। প্রথমেই তিনি গেলেন উজীর আলী নকী খাঁর ঘরে। কিছু-ক্ষণ পরে আলী নকী খাঁ ও আর কয়েক জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হোল।

এডমনষ্টোন সাহেব অতঃপর নবাবের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। নবাব পারিষদগণে বেষ্টিত হয়ে একটি কেদারায় বসে ছিলেন। সবাই গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন। আসন গ্রহণ করে এডমনষ্টোন সাহেব নবাবকে বললেন, "গভর্ণর জেনারেল সংবাদ পেয়েছেন, গুপ্তচরগণ আপনার নাম করে বৃটিশ রাজ্যের চারদিকে সিপাইদের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে। এই জন্য গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করেন।" নবাব ওয়াজিদ আলী আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু এডমনষ্টোন সাহেব সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললেন যে, এব্যাপারে তাঁর কোনই হাত নেই। তিনি গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালন করতে এসেছেন মাত্র।

১৫ই জুন সকাল বেলা নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ তিনজন পারিষদ সহ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আবদ্ধ হলেন।

www.pathagar.com

সাবাস চট্টগ্রাম

১৮ই নভেম্বরের স্মরণীয় রাত্রি।

চট্টগ্রামের সিপাইদের ৩৪নং রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করে বসল।

এইখান থেকেই আমাদের কাহিনী শুরু। সেদিনকার বাংলাদেশে—কলকাতায় নয়, ব্যারাকপুরে নয়, জলপাইগুড়ীতে নয়, ঢাকায় নয়, আর কোন অঞ্চলে নয়, সিপাইদের প্রথম ও স্বাধীন অভ্যুত্থান চট্টগ্রামেই যে প্রথম ঘটেছিল, এ কথা আমরা অনেকেই কিন্তু জানি না।

সেদিনকার বাংলাদেশে বিদ্রোহের মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সবাই আশায় ও আতংকে ব্যারাকপুরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সকলের দৃষ্টিই একই দিকে নিবদ্ধ। শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতি বিজড়িত এই ব্যারাকপুর! শহীদের প্রাণদান কি বৃথাই যাবে! উত্তর ভারত থেকে বিদ্রোহের উত্তপ্ত হাওয়া বার বার এসে ঝাপটা মেরে গেছে তার বন্ধ দরজায়। ফকীর আর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরে কত বার কত প্রচারকের দল বিদ্রোহের অগ্নিবাণী শুনিয়ে গেছে! লক্ষ্ণৌর প্রাক্তন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র মন্ত্রী আলী নকী খাঁ কলকাতার মুচি খোলায় বসে ষড়যন্ত্রের সুতো টেনে চলেছেন, দিনের পর দিন আগুনে ফুঁ দিয়ে চলেছেন! কিন্তু কই, আগুণ তো সেখানে জ্বলে উঠল না। ১৩ই জুন তারিখে হিয়ার্সে সাহেব হন্তদন্ত হয়ে কলকাতায় খবর পাঠালেন, ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে, অবিলম্বে সাহায্য পাঠাও। খবরটা হয়তো ঠিকই ছিল। কিন্তু খবরটা পূর্বাহ্নেই ফাঁস হয়ে যাওয়াতে গভর্ণমেণ্টই এগিয়ে এসে আঘাত করল। সাজানো কামানের মুখে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব হোল না। কর্তৃপক্ষের আদেশে তারা নিঃশব্দে হাতের অস্ত্র নামিয়ে রাখল।

জলপাইগুড়িতে বিদ্রোহের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলা হচ্ছিল। কিন্তু গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল।

www.pathagar.com

শৃঙ্খলিত ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হোল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর তারিখে। কিন্তু সেও তো চট্টগ্রামের পরে। ঢাকায় সিপাইরা ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, এ সংবাদ আমরা জানি, কিন্তু এখানেও ইংরাজ সৈন্যেরাই প্রথম গিয়ে আঘাত করল। তার প্রতিরোধ করতে গিয়েই বিখ্যাত 'কালা-ধলার লড়াই' ঘটে গেল।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রামের সিপাইরাই সবার আগে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল, মরা গাঙ্গে তারাই প্রথম বান জাগিয়ে তুলল, এই কথাটি স্মরণ করে রাখবার মত। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। চট্টগ্রামের সিপাইদের মধ্যে ব্যারাকপুরের সিপাইদের একটা দলও ছিল, সেখান থেকে তারা বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র বহন করে নিয়ে এসেছিল, এই অনুমান অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয় কথা, চট্টগ্রামে সরকারী তৎপরতা ছিল খুবই কম, বিদ্রোহ করতে গিয়ে বিদ্রোহীদের সরকারী বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

কিন্তু সমস্ত কথা বলার পরেও একথা জলন্ত সত্য যে, সমস্ত বাংলাদেশে চট্টগ্রামের সিপাইরাই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য রাজপথে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়েছিল। ১৯৩০ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সমস্ত বাংলাদেশ, তথা সমস্ত ভারত জুড়ে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—সাবাস চট্টগ্রাম! ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিবেলায় চট্টগ্রাম যখন বিদ্রোহের পথ দেখাল, সেদিনকার বাংলা দেশ জুড়ে কি তেমনি জয়ধ্বনি ওঠেনি—'সাবাস চট্টগ্রাম'?

নিজেদের অতীত সম্পর্কে অচেতন থেকে, অবহেলা করে, আমরা আমাদের ইতিহাসকে হারিয়ে ফেলেছি। কত গৌরবময় কাহিনী, কত বীর শহীদের নির্ভীক আত্মদান, কত উন্মাদনাময় রোমাঞ্চকর ঘটনা, কত রক্ত ও অশ্রুর নিঃশব্দ আত্মনিবেদন আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন।

আজ আমরা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। বিদেশীর লেখা ইতিহাসে যাকে দুর্বৃত্ত ও বদমাসদের অনাচার ও নষ্টামি বলে আখ্যা দিয়েছে, এতদিন সেই ইতিহাস নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। আজ

www.pathagar.com

আর তাকে আমরা মেনে নিতে পারছি না। এই 'বদমাসদের নষ্টামির' ইতিহাসের মধ্যেই আমরা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রাণময় আহ্বান খুঁজে পেয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রতিদিনের বাঁচবার সংগ্রামের সঙ্গে সেই মহাবিদ্রোহের অন্তর্গূঢ় যোগাযোগ আজ আমাদের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তাই আজ আমরা ইতিহাসের বন্ধ দরজার উপর বার বার করাঘাত করে চলেছি, ইতিহাস, দরজা খোল! আমাদের এক গৌরবময় ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার তোমার বুকে লুকিয়ে রেখেছ! —ইতিহাস, দরজা খোল, আমরা তাকে দু চোখ ভরে দেখতে চাই- দেখে ধন্য হতে চাই। এ দরজা কি খুলবে না? চট্টগ্রামের সেই বীর সিপাইদের বিদ্রোহের কাহিনী—তার তাৎপর্য কি শুধু চট্টগ্রামের মধ্যেই নিহিত? সমস্ত বাংলাদেশের প্রাণোন্মাদনা কি তাকে রস যোগায় নি?

১৮ই নভেম্বরের স্মরণীয় রাত্রি।

চট্টগ্রামের সিপাইদের ৩৪নং রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করে বসল।

সংবাদ পেয়ে অফিসারেরা ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলেন তাদের ঠাণ্ডা করবার জন্য। প্যারেডের ময়দানে জমায়েত হবার জন্য সবাইকে আদেশ দেওয়া হোল। সামরিক শৃংখলা রক্ষা করতেই হবে।

সামরিক শৃংখলা? কে আজ মানবে! এতদিনকার পরাধীনতার শৃংখল টুকুরো টুকুরো করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য যারা অধীর হয়ে উঠেছে, এই শৃংখলা তাদের জন্য নয়। অফিসারের ডাকে কেউ সাড়া দিল না।

কে একজন চীৎকার করে উঠল, 'মারো মারো ফিরিঙ্গীকো!" সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটা বন্দুক নিয়ে তাক করল তার দিকে। কয়েকজন মাঝখানে পড়ে তাকে নিরস্ত করল—'কি হবে ওকে মেরে। দাও, ছেড়ে দাও!' ক্যাপটেনকে ডেকে তারা বলল,

"সাহেব, আমরা তোমাদের কাউকে মারতে চাই না। তোমরা যে কয়জন এখানে আছো, প্রাণের মায়া যদি থাকে, এখান থেকে এক্ষুণি পালাও। সময় বড় খারাপ পড়েছে, লোকগুলো ক্ষেপে উঠেছে, কখন যে কি করে বসে, বলা যায় না তো।"

www.pathagar.com

ক্যাপটেন অবস্থাটা বুঝলেন। কথা ঠিক, শৃংখলা-রক্ষার চিন্তাটা আপাততঃ না করাই ভালো। আর একটুও দেরী করা চলে না। প্যারেডের ময়দান থেকে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন।

বিদ্রোহী সিপাইরা কাউকে প্রাণে মারল না। রক্তপাত করবার দিকে তাদের ঝোঁক ছিল না। প্রাথমিক কাজ হিসাবে তারা সরকারী তোষা-খানা থেকে ৩ লক্ষ টাকা লুটে নিল, জেলখানার কয়েদীদের ছেড়ে দিল, সৈন্যদের ব্যারাক পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল, অস্ত্রাগার দিল উড়িয়ে।

তারপর তিনটা সরকারী হাতী ও দুটো ঘোড়ার উপর তাদের লুটের মাল চাপিয়ে বিদ্রোহী সিপাইরা চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে ত্রিপুরার দিকে যাত্রা করল। কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যাত্রা করেছিল, এর পিছনে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল কিনা, ভারতব্যাপী বিদ্রোহের সঙ্গে এর কোন যোগসূত্র ছিল কিনা, না কি এ-শুধু বহুদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভের আকস্মিক বিস্ফোরণজাত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র, এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে!

হাবিলদার রজব আলী খাঁ। বিদ্রোহী সিপাইদের পরিচালনার ভার তাঁর উপরেই এসে পড়ল। বিদ্রোহীরা স্থির করেছিল যে, তারা ইংরাজের রাজত্ব ছেড়ে স্বাধীন ত্রিপুরার নিরাপদ অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। রজব আলী খাঁ তাঁর বাহিনী সেই পথেই পরিচালিত করলেন।

সরলমন সিপাইরা ভাবতেও পারে নি, ইংরাজের আসল গোলামেরা স্বাধীনতার তক্‌মা এঁটে তাদের ইংরাজ প্রভুর হুকুম তামিল করে চলেছে। ভারতব্যাপী মহাবিদ্রোহের দিনে এই সমস্ত তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যের রাজা, মহারাজা ও নবাবের দল অনুগ্রহ লাভের আশায় জনসাধারণের আক্রমণ থেকে তাদের প্রভুকে রক্ষা করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। হায়দরাবাদের নিজাম, সিন্ধিয়া, গায়কোয়ার, ভূপালের বেগম, কাশ্মীরের গোলাব সিং আর কত নাম করব, এরকম বহু অশুভ উপগ্রহ সেদিন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত দুশমনি করেছিল। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা তাদেরই একজন।

চট্টগ্রামের কমিশনার স্বাধীন ত্রিপুরার রাজার কাছে সংবাদ পাঠালেন, বিদ্রোহী সিপাইরা তোমার রাজ্যের দিকে চলেছে, তাদের আটকাও!

www.pathagar.com

অতি বশংবদ স্বাধীন রাজা উত্তরে জানালেন—জী হুজুর, প্রস্তুত আছি।

শুধু রাজার কাছে নয়, কমিশনার সাহেব পার্বত্য প্রদেশের আরও দুইজন বড় বড় জমিদারের কাছেও এই মর্মে চিঠি দিলেন।

বিদ্রোহীরা সীতাকুণ্ড হয়ে ২রা ডিসেম্বর তারিখে 'স্বাধীন' ত্রিপুরার প্রবেশদ্বারে গিয়ে পৌঁছল। গিয়ে দেখল, বহু সশস্ত্র সৈন্য সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিদ্রোহীদের অভিনন্দন বা অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নয়, তাদের ধ্বংস করবার জন্য তরোয়ালে শান দিচ্ছে।

সেখানে বাধা পেয়ে তারা সেখান থেকে ফিরে কুমিল্লার পাহাড় এলাকার দিকে চলল। এখান দিয়ে যাবার সময় তাদের চরম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তাদের তিনটি হাতী এখানে হাতছাড়া হয়ে যায়, দশ হাজার টাকা খোয়াতে হয়, অনেক লোকও ধরা পড়ে যায়। ত্রিপুরার রাজা ও জমিদারেরা বার বার আক্রমণ করে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। আর কোন পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা মণিপুর রাজ্যের দিকে এগোতে থাকে।

মণিপুরের পথে শ্রীহট্টে গিয়ে তাদের বাধা পেতে হয়। মেজর বাঈঙ্গের নেতৃত্বে শ্রীহট্টের পদাতিক দল তাদের উপর আক্রমণ চালায়। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাইরা শ্রীহট্টের সিপাইদের আপনাদের পক্ষে টেনে আনবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টায় কোনই ফল হয় না। লাতু নামক একটা জায়গায় দুই পক্ষের যুদ্ধ হয়; মেজর বাইঙ্গ নিহত হন। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাইরা প্রতিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে লাতু ও মণিপুরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বনের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করল।

বিদ্রোহীরা মণিপুর রাজ্যের সীমানার মধ্যে পেঁছে গেল। এর পরেও শ্রীহট্টের সিপাইদের সঙ্গে তাদের দুবার যুদ্ধ হয়। আক্রমণের আশংকায় শেষ পর্যন্ত তাদের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। পর পর কয়েকটা যুদ্ধে তাদের পক্ষের অনেক লোক মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল, তাদেরও বাইরে বেরিয়ে আসবার কোনই পথ ছিল না। এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তারা আটক পড়ে গেল। তার পর তাদের কি হয়েছিল, সে ইতিহাস কেউ জানে না।

www.pathagar.com

ঢাকায় কালা-ধলার লড়াই

ঢাকা শহর, ১৮৫৭ সালের জুন মাস।

জজসাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিলেন। গত ক'দিন ধরে খুব বেশী করেই ভাবছেন। সারা ভারতের উপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে চলেছে, ঢাকার মাথার উপর তা' কখন ভেঙ্গে পড়ে! ঝড় থামবার কোনই লক্ষণ নেই, দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজ মীরাট, কাল দিল্লী, তার-পর বারানসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর···একটির পর একটি ঝড়ের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়েছে। এর শেষ কোথায়?

ভাবতে ভাবতে জজসাহেব ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় বেয়ারা এসে সেদিনকার ডাকের "দৈনিক হরকরা" দিয়ে গেল। বেয়ারার ডাকে ঝিমুনীটা ভেঙ্গে গেল, কিন্তু ঘুমের জড়তাটা তখনও কাটে নি। ঘুম ঘুম চোখেই কাগজটা টেনে নিলেন।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড! জজসাহেব চীৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, মাই গড্! কি বলবেন, কি করবেন, খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত এলার্ম বেল্‌টা বাজিয়ে দিলেন। ঢং ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তে লাগল।

কি হয়েছে, কি হয়েছে! চারদিক থেকে লোক ছুটোছুটি করে আসতে লাগল। কাচারীর কাছে ভীড় জমে গেল। সবার মুখেই এক প্রশ্ন—কি হয়েছে?

হাঁপাতে হাঁপাতে জজসাহেব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওরা আসছে।"

"ওরা কারা?"

"আহা, কারা আবার, সিপাইরা।"

"সিপাইরা?

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিউটিনি শুরু হয়ে গেছে যে।"

আর কিছুই বলতে হোল না। হুড়-মাড় দুড়-দাড় করে দেখতে দেখতে কাচারী থেকে সমস্ত মানুষ ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। 'ওরা

www.pathagar.com

আতংক দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আর্মেনিয়ানরা দলে দলে ঢাকা ছেড়ে কলকাতার দিকে পাড়ি দিচ্ছে। ইউরোপিয়ানরা তাদের মিলগুলিকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। এগুলি সুরক্ষিত করে তোলা দরকার। সাহেবদের মধ্যে এত আতংক কিসের, দেশী লোকেরা ভাল করে বুঝতে পারে না। ভলানটিয়ার বাহিনী যখন রাত্রিতে পাহারা দিতে বেরোয় এরা অবাক হয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে।

আগষ্ট গেল, সেপ্টেম্বর গেল, এল অক্টোবর। হাওয়া এবার উলটো দিকে বইতে শুরু করেছে। বিদ্রোহীরা ঘাঁটির পর ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে পিছনে হটে আসছে। দিল্লীর পতন হয়েছে। উদ্যোগ চলে গিয়েছে ইংরাজদের হাতে, বিদ্রোহীরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। ঢাকার ইউরোপিয়ান মহলে কিছুটা আশ্বস্তির ভাব ফিরে আসছে।

এই অক্টোবর মাসেই সিপাইদের ভিতরকার অবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। সিপাইরা বিদ্রোহের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু আগু হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। তার আগেই তাদের টুটি চেপে ধরা হোল।

আমাদের দেশের মানুষ হয়েও যারা সেদিন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, প্রধানতঃ যাদের উপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদ সেদিন তার খোঁড়া পায়ে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল, বৃটিশের সেই সমস্ত বন্ধু সারা ভারত জুড়েই ছিল। ঢাকাতেও তার অভাব হয় নি। ঢাকার নবাব বাড়ীর খাজা আবদুল গণি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

ঐতিহাসিক কে সাহেব তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছেন, আমি শুধু সেই-টুকুই তুলে দিচ্ছি ঃ

"এক সম্ভ্রান্তজাত ভদ্রলোক তখন ঢাকার জমিদার ছিলেন। তিনি ভাল ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারতেন। তাঁর নাম খাজা আবদুল গণি। তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন পুরোপুরিভাবে বৃটিশের পক্ষেই ছিল। ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিনি কমিশনারকে লিখে জানালেন যে, এখানে একটা গুজব ছড়িয়ে গেছে যে, ৭৩নং নেটিভ্ ইন্‌ফ্যানট্রির দুটো কোম্পানী নাকি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং তারা নাকি তাদের প্রতিবেশীদের কাছে

www.pathagar.com

বলেছে যে, ইংরাজের নৌ-সেনাদের সঙ্গে তাদের শীগগিরই একটা যুদ্ধ বাঁধবে। সে জন্যই তারা তাদের পরিবার পরিজনকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। তিনি লিখলেন, তাঁর মতে এই দুটি কোম্পানীকে জলপাইগুড়িতে পাঠিয়ে দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ পন্থা।"

খাজা আবদুল গণির কাছ থেকে এই সংবাদটা পাওয়ার ফলে ইংরাজদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল।

ভারতীয় বিদ্রোহের মূল ধারায় যখন ভাঁটার টানের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, পূর্ববঙ্গের শাখা ধারায় তখন জোয়ারের ডাক এসে পৌঁছল! এই অদ্ভুত রহস্যের ব্যাখ্যা করার মত কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। মে থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয় বিদ্রোহ যখন গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছিল পূর্ববঙ্গের তথা সারা বঙ্গের সিপাইরা তখন বসে বসে কি ভাবছিল?

১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪নং রেজিমেণ্টের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ২১ শে নভেম্বর সেই খবর ঢাকায় এসে পৌঁছল।

সেই দিনই সন্ধ্যা ছ'টার সময় সরকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার পরদিন ২২ শে নভেম্বর রবিবার ৭৩নং নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে।

২২ শে নভেম্বর সকাল বেলায় নৌ-সেনা বিভাগের লেফটেনাণ্ট লিউইস জাহাজী গোরা সৈনিকদের নিয়ে কাজে নামলেন। তাদের সঙ্গে ছিল দুটো কামান। প্রথমে তিনি তোষাখানায় গিয়ে সেখানকার সিপাই-দের অস্ত্র নিয়ে নিলেন। তারপর প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়রক্ষক সিপাইদের নিরস্ত্র করা হয়। তারপর মাল-গুদামের সিপাইদের পালা। কোন জায়গাতেই বাধা পাওয়া যায় নি। বাধা পাওয়া গেল লাল-বাগে। তারা হাতের অস্ত্র ছাড়তে রাজী হোল না। ঢাকার সিপাইদের বহু-বিলম্বিত বিদ্রোহ এবার সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের রূপ নিয়ে দেখা দিল।

লেফটেনাণ্ট লিউইস লালবাগ অবরোধ করলেন। দুই পক্ষে প্রবল গুলীবর্ষণ চলল। চল্লিশ জন সিপাই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল, অনেকে

www.pathagar.com

গুরুতর জখম হয়ে পড়ে রইল। প্রাণ বাঁচাবার জন্য যারা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নদীতে ডুবে মারা গেল। ইংরাজরা বলেন, তাদের পক্ষে মাত্র একজন নাকি এই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।

লালবাগ অঞ্চলের বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি, তাঁরা তাঁদের ছেলেবেলায় তাঁদের দাদী-নানীদের মুখে এই কালা-ধলার লড়াইয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে শিউরে উঠতেন। মৃত্যুপথের যাত্রী এই জখমী মানুষগুলি যখন আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে 'পানি' 'পানি' বলে চীৎকার করছিল, তাদের সেই আর্তকণ্ঠ লালবাগের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে বাইরের মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাদের সেই আর্তনাদে কত মায়ের চোখে অশ্রু ঝরেছিল, কত ভাই বোনের প্রাণ রুদ্ধ আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল! কিন্তু নির্মম সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হিংস্র অনুচরের দল সেদিন পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। লালবাগের কালো মানুষ সেদিন তার কালো সিপাই ভাইদের জন্য বিনিদ্র নয়নে ছটফট করে কাটিয়েছে।

সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বলাবলি করত, তারা স্বকর্ণে শুনেছে! রাত্রি যখন গভীর হয়ে আসত, একটা নিঃসীম নিঃশব্দতার কালো পর্দা নেমে আসত ঘুমন্ত লালবাগে, মাঝে মাঝে আকস্মিক দমকা হাওয়ায় বুড়ীগঙ্গার পানিতে জেগে উঠত মর্মরিত বিলাপ, তখন ঠিক সেই সময় লালবাগের ভাঙ্গা প্রাচীরের অন্তরাল থেকে কাদের করুণ কণ্ঠ ভেসে আসত ঃ ভাইয়া, পানি দে। এ মাল্লি থোড়া পানি দে।

আজকার ভিক্টোরিয়া পার্ক রূপগরবিনী সুন্দরীর মত ফুলের হাসি হাসছে। পথচলতি মানুষ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরানো ঢাকার সেই অতিপরিচিত আণ্টাঘরের ময়দান। আজ তার কত বর্ণ কত বিলাস! কিন্তু এখনকার লোকেরা কি জানে, এই ফুলের হাসির অন্তরালে সে কি এক নিষ্ঠুর ও বীভৎস স্মৃতি বহন করে চলেছে?

লালবাগের সেই খণ্ডযুদ্ধে যে সব সিপাইরা বন্দী হয়েছিল, যে সব পলাতকেরা ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে লাগল, তাদের সবাইকে সেদিন আণ্টাঘরের ময়দানে গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা

www.pathagar.com

হয়েছিল। ঢাকার কালো মানুষেরা আতংকে চোখ বুজল। কোথায় ছিল তাদের বাড়ীঘর কে জানে! কোথায় রইল তাদের বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা! তাদের এই শেষ খবরটুকু কেই বা পৌঁছে দেবে তাদের কাছে!

দিনের পর দিন মৃতদেহগুলি ঝুলতে লাগল, পচে গলে পড়তে লাগল, শকুনেরা মহোৎসবে মেতে গেল। ঢাকা শহরের মানুষের মনে আতংক ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে আণ্টাঘরের ময়দানে ইংরাজ তার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করল।

আণ্টাঘরের সেই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তখনকার দিনের ঢাকা শহরের একজন নাগরিক একটু উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর নাম হৃদয়নাথ মজুমদার। তিনি তাঁর 'দি রেমিনিসেন্‌স অব ঢাকা' নামক বইটিতে লিখেছেন ঃ

'তাদের সব ক'জনাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। আণ্টাঘরের ময়দানে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার পর থেকে ঢাকার লোক এই জায়গাটাকে ভয়ের চোখে দেখত। বাঙ্গলাবাজার, শাখারী-বাজার, কলতাবাজার এবং চারিদিককার অন্যান্য মহল্লার লোকদের মধ্যে এ নিয়ে নানারকম গল্প চলতি ছিল। রাত্রিবেলা নিহত লোকদের প্রেতাত্মারা নাকি ময়দানে ঘুরে বেড়াত এবং সেখান থেকে নাকি আর্তনাদ ও নানারকম বিকট শব্দ শোনা যেত। বুড়োবুড়ীদের কাছে আমরা এই সমস্ত গল্প শুনতাম। সন্ধ্যার পরে ভয়ে ওদিক মাড়াতাম না।"

লালবাগ, ঢাকা শহরের পবিত্র ভূমি। এখানে বীর সিপাইরা সাম্রাজ্য-বাদীদের অনুচরদের আদেশে, প্রাণের ভয়ে হাতের অস্ত্র ছেড়ে দেয় নি, আত্মসমর্পণ করেনি, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে। একদিন সারা ভারত জুড়ে অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্য যে দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হয়েছিল, আমাদের ঢাকার বীর সিপাইরা সেই অভিযানের নির্ভীক যাত্রী। বুকের শেষ রক্ত বিন্দু বিসর্জন দিয়ে তাঁরা আমাদের যাত্রাপথকে উজ্জল করে তুলেছেন। তাঁদের নিশান আমাদের পথ দেখিয়েছে।

শহীদের রক্তে ভেজা শহরের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছে। এই উর্বর জমিতে তাজা ফসল ফলছে, ফলবে। দেশের ডাকে প্রাণ উৎসর্গ করবার লোকের

www.pathagar.com

অভাব এখানে কোনদিনই হবে না। ১৯৫২ সালের বাংলাভাষার বীর শহীদেরা তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এখানকার আকাশে বাতাসে বীর শহীদদের বজ্র আহ্বান নিরন্তর ঘোষিত হয়ে চলেছে। এখানকার মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া দিতে কোনদিন পশ্চাৎপদ হবে না।

সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা অচেতন হয়ে ছিলাম। একশো বছর আগেকার আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের বীর শহীদদের আমরা চিনতে পারিনি, তাদের আমরা স্বীকার করিনি। কিন্তু আজ হাওয়া বদল হয়ে গিয়েছে। আমরা লক্ষ শহীদানের আত্মদানের মহিমায় উজ্জ্বল অতীতকে ফিরে পেয়েছি। আমরা বেঁচে গেছি। বীর শহীদদের রক্তে লাল লালবাগ তাই আজ আমাদের চোখে মহান হয়ে দেখা দিয়েছে।

আজ স্বপ্ন দেখছি—এ স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠতে বেশী দেরী নেই—এই লালবাগে একদিন বীর বিদ্রোহীদের স্মরণ করে স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি স্বপ্ন দেখছি, পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের দেশপ্রেমিকেরা একদিন দলে দলে জিয়ারত করতে আসবেন এই পুণ্যতীর্থে। শহীদ-বেদীতে প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়ে ফিরে যাবেন। হতাশ দেশসেবকেরা এখানে এসে তাঁদের ভাঙ্গা মনকে জোড়া দিয়ে নিয়ে যাবেন, প্রতিকূল অবস্থার হতাশা, অবসাদ ও ক্লান্তির মধ্যেও এখানে এসে তাঁরা নতুন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে যাবেন।

আমি সেই স্বপ্নই দেখছি। জানি, আমার এই স্বপ্ন দেখা নিষ্ফল হবে না।

লালবাগের খণ্ড যুদ্ধের পর অধিকাংশ সিপাই ঢাকা ছেড়ে তাদের হেড কোয়ার্টার জলপাইগুড়ির দিকে ছুটল। গভর্ণমেণ্টের মতলব ছিল ঢাকার সিপাইদের ঢাকাতেই খতম করে দেওয়া, যাতে তারা অন্যত্র গিয়ে উপদ্রবের সৃষ্টি করতে না পারে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। জাহাজী গোরা সৈন্যদের নায়ক মিঃ লিউইস তাদের অবরোধ করেছিলেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ সিপাই সেই বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এবং তাদের আগেকার পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা জলপাইগুড়ির দিকে যাত্রা করল।

www.pathagar.com

ঢাকার বিদ্রোহী সিপাইরা জলপাইগুড়ির দিকে আসছে শুনে সরকারী মহলে 'সামাল্', 'সামাল্' রব পড়ে গেল। ভাগলপুরের কমিশনার ইউল সাহেব তাদের আটকাবার জন্য সসৈন্যে জলপাইগুড়ীর দিকে যাত্রা করলেন। ঢাকার সিপাইরা তিস্তা নদী পার না হতেই ইউল সাহেব এসে তাদের ধরে ফেললেন। ইউল সাহেবের লক্ষ্য ছিল এরা যাতে কিছুতেই তিস্তা পার হতে না পারে। কিন্তু এদের আটকে রাখা সম্ভব হোল না। এরা অন্য পথ দিয়ে নদী পার হয়ে গেল। ইউল সাহেব তাদের পিছনে পিছনে ছুটলেন। সিপাইরা বৃটিশ এলাকা ছেড়ে নেপাল রাজ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিশ্চিন্ত হবার যো নেই। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজদের পরম বন্ধু বা বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইউল সাহেব ঢাকার সিপাইদের শায়েস্তা করবার জন্য জঙ্গ বাহাদুরকে লিখে পাঠালেন।

জঙ্গ বাহাদুর এই কাজ হাসিল করবার জন্য রত্নমণি সিং নামে একজন নেপালী সেনাপতিকে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাতে কোনই কাজ হোল না। সিপাইরা নেপালের অরণ্যময় পার্বত্য পথ দিয়ে এমন কৌশল করে অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে পালিয়ে গেল যে ইংরাজ ও নেপালীরা বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের ধরতে পারল না।

www.pathagar.com

তাঁতীয়া টোপী

"আমার নাম তাঁতীয়া টোপী। আমার বাবার নাম পাণ্ডুরঙ্গ। আমি বিঠুরের অধিবাসী। আমার বয়স পয়তাল্লিশ। আমি নানা সাহেবের দেহরক্ষক বা এইড্-ডি-ক্যাম্প হিসাবে কাজ করে এসেছি।"

"১৮৫৭ সালের মে মাসে কানপুরের কালেক্টর নানাসাহেবকে তাঁর সৈন্য ও কামান নিয়ে বিঠুর থেকে কানপুরে এসে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। নানা সাহেব তাতে রাজী হওয়ায় নানা সাহেব ও আমি একশো সিপাই, তিনশো বন্দুকধারী ফৌজ ও দুটি কামান নিয়ে কালেক্টর সাহেবের বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমরা যে তার সাহায্যের জন্য এসেছি, এটা তার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা, কারণ সিপাইরা বড় বেশী অবাধ্য হয়ে উঠেছে।"

"এর দুদিন বাদে ইনফ্যানট্রির তিনটি রেজিমেণ্ট ও সেকেণ্ড লাইট ক্যাভেলরির সওয়াররা আমাদের ঘেরাও করে নানা ও আমাকে তোষা-খানার মধ্যে বন্দী করে রাখল এবং অস্ত্রাগার ও তোষাখানা নিঃশেষে লুট করল। তা থেকে নানার হাতে তারা দুই লাখ এগার হাজার টাকা দিল। আবার সেই টাকা পাহারা দেবার জন্য তারা তাদের নিজেদের শান্ত্রী মোতায়েন করল। ইতিমধ্যে আমাদের দলের সিপাইরা বিদ্রোহী সিপাইদের দলে ভিড়ে গিয়েছে।"

"এর পর সিপাইরা নানা সাহেবকে, আমাকে ও আমাদের সমস্ত লোক জনকে নিয়ে যাত্রা করল। বলল, চলুন, আমাদের সঙ্গে দিল্লী যেতে হবে। কানপুর থেকে তিন ক্রোশ পথ যাবার পর নানা সাহেব বললেন, বেলা শেষ হয়ে এসেছে, এখানেই আমাদের বিশ্রাম নেওয়া ভাল। কাল সকালে আবার যাত্রা করা যাবে।"

"পরদিন সকালে সিপাইরা যাবার প্রস্তাব করাতে নানা সাহেব অস্বীকার করে বসলেন। সিপাইরা তখন বলল, 'তাহলে আমাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

কানপুরে ফিরে চলুন, সেখানে যুদ্ধ করতে হবে। নানা তাতেও আপত্তি জানালেন। কিন্তু সিপাইরা মানল না। আমাদের নিয়েই কানপুরে ফিরে এল।"

[তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরী]

ইতিহাসের দিক থেকে তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরীর এই অংশটুকু খুবই দামী। যারা মনে করেন কানপুর বিদ্রোহের নেতা নানা সাহেব, তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরী পড়লে এই ভুল আর তাদের থাকবে না। পেশোয়ার বংশধর নানা সাহেব তখন সমস্ত হিন্দু মনের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল, কি মুসলমান কি হিন্দু সমস্ত বিদ্রোহীরাই এ বিষয়ে সচেতন ছিল। কাজেই তারা হুঁশিয়ার হয়ে তাদের নেতাকে সামনে রেখে সঙ্গিনের মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছিল, এড়িয়ে যাবার বা পিছিয়ে পড়বার কোনই সুযোগ দেয় নি।

এ পর্যন্ত বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তাঁতীয়া টোপীর যে বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল তাও মনে হয় না। নানা সাহেবের অতি বিশ্বস্ত দেহ রক্ষক হয়ে তিনি দিন যাপন করছিলেন। কেই বা জানত কি আছে তার মধ্যে, কোন ধাতু দিয়ে তিনি তৈরী! বিদ্রোহ ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে তাঁর কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। বিদ্রোহ এই অনভিজ্ঞ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সন্তানকে শক্তিশালী বৃটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে দুর্দম সামরিক অধিনায়কে রূপান্তরিত করল।

কিন্তু তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরীর মধ্যে তাঁর এই রূপ কোথাও খুঁজে পাবেন না। নিতান্ত সাদাসিধে সংক্ষিপ্ত কথায় কতগুলো ঘটনার বিবৃতি। এর মধ্যে কোথাও এতটুকু আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, নিজের গৌরব প্রচারের সামান্য প্রচেষ্টাটুকু নেই। যে তাঁতীয়ার সামরিক প্রতিভার খ্যাতি সেদিন শুধু হিন্দুস্তান নয় সমগ্র ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়েছিল, এই ডায়েরীর মধ্যে কোথাও সেই পরিচয় খুঁজে পাবেন না। "আমরা হেরে গেলাম", "আমরা পালিয়ে গেলাম," "সবগুলি কামান ফেলেই আমরা পালালাম", সমস্ত ডায়েরী জুড়ে বার বার এই একই কথার পুনরাবৃত্তি। তাঁর কোন কৃতিত্বের কথা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

দলের পর দল ইংরাজ সৈন্য তাঁকে ধরবার জন্য ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, কখনও পিছন থেকে, কখনও সামনে থেকে, কখনও বা পাশ থেকে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ক্রমাগত দশ মাস পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলে চলেছেন, একা নয়, হাজার হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে। শত্রুপক্ষকে বোকা বানিয়ে কতবার তিনি তাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। একদিকে ইংরাজের ঘোড়সওয়ার আর একদিকে তাঁর পদাতিক বাহিনী, এই দুই দলে দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলেছে। একমাত্র দ্রুত অপসরণের যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই অসম প্রতিযোগিতায় তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন।

তাঁর রণপ্রতিভার পরিচয় পেতে হলে তাঁর প্রতিপক্ষের কাছেই যাওয়া ভাল। তাঁতীয়ার অদ্ভুত সমরচাতুর্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তখনকার 'টাইমস' পত্রিকা লিখেছিল ঃ

"আমাদের বন্ধু তাঁতীয়া কেন্দ্রের পর কেন্দ্র বিধ্বস্ত করে চলেছেন, তোষাখানা লুট করেছেন, অস্ত্রাগার নিঃশেষ করেছেন, ফৌজ সংগ্রহ করেছেন, তাদের হারিয়েছেন, যুদ্ধ জয় করেছেন, যুদ্ধে হেরেছেন, দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে কামান কেড়ে নিয়েছেন, তাদের হারিয়েছেন। বিদ্যুতের মত তাঁর গতি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি দিনে ৩০।৪০ মাইল মার্চ করে চলেছেন, নর্মদা নদী পারাপার করেছেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ বাহিনীগুলির ভিতর দিয়ে, পিছন দিয়ে, সমুখ দিয়ে চলে গিয়েছেন। পাহাড়, নদী, গহ্বর, উপত্যকার উপর দিয়ে, জলাভূমির ভিতর দিয়ে, কখনও সামনে, কখনও পিছনে, কখনও পাশ ঘেঁসে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে চলেছেন।"

শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" জনৈক ইংরাজ লেখক লিখছেন ঃ

"তারপর শুরু হোল সেই অদ্ভুত পশ্চাদপসরণের পালা। একটির পর একটি, ক্রমাগত দশ মাস ধরে এই খেলাই চলেছে। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে অধিকাংশ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সেনাপতিদের চেয়ে তাঁতীয়ার নাম অনেক বেশী পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সামনে যে সমস্যাগুলি ছিল তাদের কোনমতেই সহজ বলা চলে না। পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটছে, তার

www.pathagar.com

মধ্যেও একদল প্রাচ্যদেশীয় সিপাইকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে হচ্ছে। অথচ এই সংহতিকে শক্তিশালী করে তুলবার জন্য আর কোন বন্ধনীই তো ছিল না। একমাত্র যা ছিল, তা হচ্ছে বৃটিশ জাতির প্রতি ঘৃণা ও বৃটিশের ফাঁসিকাঠ সম্পর্কে আতংক। এই পাঁচ মিশালী ফৌজ কখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারেনি, তাকে সব সময় ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। শত্রু কখনও পিছন দিক থেকে তাড়া করে আসছে, কখনও বা বরাবর মধ্যভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। একমাত্র গতি-বেগের সাহায্যেই শত্রুর এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। একদিকে এই অর্ধসংগঠিত ফৌজকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন শহর দখল করতে হচ্ছে, নতুন রসদ মালপত্র সংগ্রহ করতে হচ্ছে, নতুন কামান যোগাড় করতে হচ্ছে, আর সবার উপরে সৈন্যের দলে নতুন লোক ভর্তি করতে হচ্ছে তাদের মধ্য থেকে, যারা স্বেচ্ছায় যোগ দেবে, যাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ হচ্ছে প্রতিদিন অবিরাম ছুটে চলা। তাঁর হাতে যেটুকু সুযোগ ছিল, তাই দিয়ে তিনি যে ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় তিনি সামান্য শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তাঁর সম্বন্ধে আমরা যত তাচ্ছিল্যই দেখাই না কেন, এদিক দিয়ে তিনি হায়দর আলীর সমশ্রেণীয় ছিলেন, এ কথা অবশ্যই বলা চলে। তিনি যদি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নাগপুরের মধ্য দিয়ে মাদ্রাজ পর্যন্ত চলে যেতে পারতেন, তাহলে তিনি হায়দর আলীর মতই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতেন। নেপোলিয়নের সমুখে যেমন ইংলিশ চ্যানেল, তাঁর সমুখেও নর্মদা তেমনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি-বন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম প্রথম তাঁর ফৌজ বৃটিশ ফৌজের মতই ধীর গতিতে চলত। ক্রমেই তার গতিবেগ বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ব্রিগেডিয়ার পার্কস বা নেপিয়ারের ফৌজের গতিবেগ তার তুলনায় অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। গ্রীষ্মের অগ্নিদাহ, বর্ষার অবিরল বর্ষণ, শীতের হিমেলী হাওয়া মাথায় বয়ে নিয়ে তিনি চলেছেন, ছুটেই চলেছেন।"

* * * * *

নিশুতি রাত। সমস্ত পৃথিবী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁতীয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর বন্ধু মানসিং তাঁকে সব চেয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয়

www.pathagar.com

দিয়েছেন। আজ আর কোন ভয় নেই। প্রমত্ত শিকারীর দল আজ আর তাঁকে সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে তাড়া করে ছুটবেনা।

ক্লান্ত অবসন্ন মহারাষ্ট্র শার্দূল আজ তাঁর অরণ্যবাসে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। চুপ, ওকে ঘুমোতে দাও। ও যে বড় ক্লান্ত, অনেকদিন পর একটু শান্তিতে ঘুমিয়েছে।

এমন সময় নিঃশব্দে চোরের মত কে ওই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে? রাজা মানসিং না? তাই বটে, তাঁতীয়ার পরম বন্ধু আশ্রয়দাতা মানসিং বটে। পিছনের ওই ছায়ামূর্তিগুলো কারা? কারা ওরা মানসিংএর পিছন পিছন একজনের পর একজন চুপি চুপি এসে দাঁড়াল? স্তব্ধ থমথমে রাত, এতটুকু শব্দ নেই। ঘুমন্ত তাঁতীয়ার নিশ্বাস পতনের শব্দটুকুও শোনা যাচ্ছে।

রাজা মানসিং অস্ফুট একটু সংকেত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি-গুলি তাঁতীয়ার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। শব্দ শুনে তাঁতীয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি ইংরাজের হাতে বন্দী।

১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল মধ্য রাত্রিতে তাঁতীয়া বেইমান মানসিংএর বিশ্বাসঘাতকতার জালে বাঁধা পড়লেন। তার পরদিন সকাল বেলা তাঁকে সিপ্রিতে জেনারেল মীডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সঙ্গে সঙ্গেই কোর্ট মার্শেল বসল।

বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এই অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, এই তিনদিন ধরে তদন্ত চলল।

মামলার আগে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে বলা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট অফিসারকে বললেন ঃ

"আমি একথা ভালভাবেই জানি, আমি যখন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, তখন আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতেই হবে। আদালত দিয়ে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। এ মামলায় আমি কোন অংশ গ্রহণ করতে চাই না।"

শৃংখলাবদ্ধ হাত দুটি ঊর্ধে তুলে তিনি আবার বললেন ঃ

"আমি এখন শুধু এই আশাই করি যে কামানের মুখেই হোক বা ফাঁসির

www.pathagar.com

দড়ীতেই হোক, আমি যেন এ শৃংখল থেকে মুক্তি পেতে পারি। আপনাদের কাছে আমার শুধু এই একটি আবেদন, গোয়ালিয়রে আমার পরিবারের যারা আছেন, আমার কাজের সঙ্গে তাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। আমার কাজের জন্য আমার বুড়ো বাপকে যেন দায়ী হতে না হয়।',

মামলার ফল যা হবার, তাই হোল। ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্ন ৪টায় ফাঁসির সময় ধার্য করা হোল।

তাঁতীয়া যখন ফাঁসিমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন, সৈন্যেরা চারিদিক ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁতীয়া শেষবারকার মত অনুরোধ জানালেন, তাঁর জন্য তাঁর বাবার উপর যেন কোনরূপ জুলুম করা না হয়।

অভিযোগ ও দণ্ডাজ্ঞা যথারীতি পাঠ করা হোল। মিস্ত্রি পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে দিল। তাঁতীয়া দৃঢ়পদে ফাঁসির মঞ্চের কাছে এলেন, ধীর ভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। রীতি অনুযায়ী জল্লাদ তাঁর হাত পা বেঁধে দিতে চাইল। তাঁতীয়া একটু হেসে বললেন, "অত সব অনুষ্ঠানের দরকার কি!" এই বলেই তিনি নিজেই ফাঁসির দড়ীর মধ্যে গলা ঢুকিয়ে দিলেন।

হাজার হাজার লোক লোক সেদিন এই বিদ্রোহী বীরকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল। তাদের মধ্যে অনেক ইউরোপিয়ানও ছিলেন। ফাঁসির সময় কয়েকজন ইংরাজ মহিলা তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন। জেনারেল মীড ও তার সৈন্যেরা স্থানত্যাগ করে চলে গেলে পর কয়েকজন ইংরাজ মহিলা মৃতদেহের কাছে গিয়ে এই মহাপ্রাণের স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে তাঁর কেশগুচ্ছ নিয়ে সযত্নে রক্ষা করলেন।

শেষ পর্যন্ত লর্ড ক্যানিং তাঁতীয়ার মৃত্যুদণ্ড নাকচ করবার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই আদেশ তাঁর ফাঁসির ছয় দিন পরে এসে পৌঁছল।

www.pathagar.com

অযোধ্যার বেগম

মাত্র দশদিনের মধ্যে অযোধ্যায় বৃটিশ শাসন স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল ; সামান্য চিহ্নটুকুও বাকী রইল না। সৈন্যেরা বিদ্রোহ করল, তারই সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার জনসাধারণ একশো বছরের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বিদ্রোহীরা একজন নবাব বা নায়কের প্রয়োজন বোধ করছিল, যাকে কেন্দ্র করে তাদের যুদ্ধ ও শাসনকার্য সুসংগঠিত হয়ে উঠবে, যার আহ্বানে ছোট থেকে বড়, ধনী থেকে নিঃস্ব সবাই একই পতাকার নীচে এসে দাঁড়াবে। তারা হুকুমতের একটা প্রতীকচিহ্ন খুঁজে ফিরছিল। সে প্রতীক যদি দুর্বল বা ভঙ্গুরও হয়, তবু সে সময় তার প্রয়োজন ছিল অসামান্য। বৃদ্ধ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ কলকাতার মুচিখোলায় নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করবে কে ?

বিদ্রোহীরা শূন্য স্থান পূরণ করবার ব্যবস্থা করল। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের নাবালক ছেলে ব্রিজিস কাদিরকে তারা সামনে তুলে ধরল। অযোধ্যার জনসাধারণ স্বীকৃতি দিল। এই স্বীকৃতিই সেদিন তাদের কাছে বিরাট শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৬ই আগষ্ট তারিখে বিদ্রোহীরা সগৌরবে ঘোষণা করে জানাল, "আমরা আজ আমাদের রাজার অভিষেক করলাম। এতদিনে ফিরিঙ্গীদের শাসন বরবাদ হয়ে গেল।" এই অভিষেক উৎসব সিপাইদের মনে শক্তির সঞ্চার করল। তারা নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠল।

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন না। কিন্তু এই অভিষেকের প্রধান শর্ত ছিল এই যে, এই নতুন নবাবকে অর্থাৎ তার উপদেষ্টাদের দিল্লীর বাদশাহের সকল নির্দেশ মান্য করে চলতে হবে। কেননা একথা সবাই বুঝতে পারছিলেন যে বিদ্রোহ সফল করতে হলে সবাইকে একসূত্রে গ্রথিত হতে হবে। প্রধান প্রধান সরকারী পদগুলি

www.pathagar.com

মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের মধ্যেই বণ্টন করে দেওয়া হোল। কোন কোন পুরানো উজীরকে তাঁদের পূর্বতন পদে বহাল রাখা হয়েছিল। শরফউদ্দৌলাহ্ প্রধান উজীর হলেন। অর্থ দফতরের ভার পড়ল মহারাজ বালকিষণের উপর। মাম্মুখাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। যুদ্ধ বিভাগের উজীর হলেন রাজা জয়লাল সিং। নাবালক ওয়ালীর মা বেগম হযরত মহল তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে সমস্ত কিছু পরিচালিত করবার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

অন্তঃপুরের কালো পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে এলেন অযোধ্যার বেগম—বেগম হযরত মহল। বিচিত্র এক চরিত্র! এ আগুন এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল!

বিদ্রোহ এক অদ্ভুত যাদুকর, অঘটন ঘটাতে সিদ্ধহস্ত। আপাতদৃষ্টিতে যা সম্ভাবনার অতীত, তার হাতের ছোঁয়ায় সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়ে উঠে। যে দেশের নারী মানুষের অধিকার ও মানুষের মর্যাদা পায় নি, যে দেশের গোপন অন্তঃপুরচারিনীরা বাইরের আলোবাতাস থেকে বঞ্চিত, সেই দেশের মেয়েদের মধ্যে এ কি এক অনির্বাণ আগুন জ্বলে উঠল। এরই নাম বিদ্রোহ। এরই নাম বিপ্লব।

একদিকে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই আর একদিকে অযোধ্যার রানী বেগম হযরত মহল। দুইটি জ্বলন্ত অগ্নিকুসুম! একজন যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, আর একজন স্বদেশ ও স্বজন থেকে দূরে গুর্খাদের দেশে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করলেন।

বেগম হযরত মহল কখনও অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন নি। মাত্র একবার সৈন্যদের উৎসাহিত করে তুলবার জন্য যুদ্ধের সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু যে কঠিন দায়িত্ব তাঁকে বহন করে চলতে হয়েছিল, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। দিল্লীর পতনের পর লক্ষ্ণৌ শহর তার জায়গা দখল করল, বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দু ও মুসলমান নেতারা ও হাজার হাজার সিপাই এখানে এসে জড় হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে দৃষ্টিভংগির পার্থক্য ছিল, সবাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বা একই রকমের চিন্তা নিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেন

www.pathagar.com

নি, নীতিগত ও কৌশলগত মতভেদ ছিল, ব্যক্তিগত মান অভিমানের প্রশ্ন ছিল, ঈর্ষা-বিদ্বেষ ছিল, আর সর্বোপরি ছিল আমাদের সর্বনাশা দলাদলির প্রবৃত্তি, যা বিদ্রোহের ভাঙনের মুখে চরম সংকটের সময় সব চেয়ে বেশী প্রকট হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্রোহের প্রধান দুর্বলতা ছিল এইখানেই। এই দুর্বলতাই দিল্লীর পতনকে ডেকে আনল। এরই ফলে প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। এই ভাঙ্গনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে এমন শক্তিশালী নেতৃত্ব বেরিয়ে আসতে পারে নি। অযোধ্যার বেগমের পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথা স্মরণ রাখতেই হবে যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অক্লান্ত প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলির যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে চলেছিল।

তাই সাংবাদিক রাসেল সাহেব বলেছেন ঃ

"অযোধ্যার বেগম অদ্ভুত উদ্যম ও যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন। সমস্ত অযোধ্যাকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন।"

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা প্রকাশিত হবার পর বিদ্রোহী নেতাদের বিভিন্নজনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিন্তু বৃটিশের প্রতিশ্রুতির উপর অযোধ্যার বেগমের একবিন্দু আস্থা ছিল না। মর্মে মর্মে তিনি তাদের অবিশ্বাস করতেন।

প্রাণ বাঁচাবার জন্য, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার জন্য, শত্রুর কাছে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সসম্মানে, ভারতে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, তেজস্বিনী অযোধ্যার বেগম সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন না। নির্বান্ধব ও সহানুভূতিহীন গুর্খাদের মধ্যে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়ে দিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁর জন্য একটা পেনসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি তা' প্রত্যাখ্যান করলেন। শত্রুর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে বেঁচে থাকবার বিড়ম্বনা তাঁর সইল না। স্বাধীন অযোধ্যার স্বাধীনচেতা বেগম শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন। সেই জন্যেই তাঁর কথা স্মরণ করে সমস্ত জাতি আজ পরম গর্ব ও গৌরব বোধ করে।

www.pathagar.com

নাজিম মহম্মদ হাসান

অযোধ্যার শাসনভার কোম্পানীর দখলে চলে যাবার আগে নাজিম মহম্মদ হাসান ছিলেন অযোধ্যার অন্তর্গত গোরখপুরের নাযিম বা গভর্ণর। বিদ্রোহের সময় সমস্ত অযোধ্যা রাজ্য বিদ্রোহীদের হাতে চলে আসে। সেই সময় মহম্মদ হাসান আবার তাঁর পূর্বপদে বহাল হন। বিদ্রোহ যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে এল, অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের মত মহম্মদ হাসানও বিতাড়িত পশুর মত স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে পালিয়ে ফিরছিলেন। এই সময় মহারানী ভিক্টোরিয়ার শান্তিসূচক ঘোষণাবাণী প্রকাশিত হয়। গোরখপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট খায়েরউদ্দীন আহমদ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত মহম্মদ হাসানকে আত্মসমর্পণ করবার জন্য পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে দুবার পত্র বিনিময় হয়। এই চিঠির মধ্য দিয়ে নাজিম মহম্মদ হাসানের নির্ভীক ও তেজস্বী চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বর্ণনা করে বোঝাতে হবে না চিঠিগুলি নিজেরাই কথা বলবে। চিঠিগুলি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হচ্ছে।

খায়েরউদ্দীন থেকে মহম্মদ হাসানের কাছে

তারিখ—১৩ই নভেম্বর, ১৮৫৮

"বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট খুবই শক্তিশালী। গভর্ণমেণ্ট বহু বিদ্রোহীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, এখন তাদের ক্ষমা করতে চান। হিন্দুস্থানের গভর্ণমেণ্ট চান যে বিদ্রোহীরা যেন তাদের ভুল পথ ত্যাগ করে, কেন না এই পথ তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। এই মাসে প্রকাশিত মহারাণীর ঘোষণা-পত্র এই সঙ্গে আপনাকে পাঠালাম। এই ঘোষণা পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে, যারা কোন বৃটিশ অফিসার বা বৃটিশ প্রজার হত্যার অপরাধে অপরাধী, কেবলমাত্র তাদেরই শাস্তি দেওয়া হবে। যে সমস্ত বিদ্রোহী নেতারা এই ধরণের কোন অপরাধ করেন নি তাদের প্রাণের কোন আশংকা নেই। বৃটিশ অফিসারদের বাঁচাবার জন্য যদি তাঁরা

www.pathagar.com

কোন চেষ্টা করে থাকেন, তা হলে সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করে দেখা হবে। এ অবস্থায় এখনো বিদ্রোহীদের সঙ্গে পড়ে থাকা বৃথা। এতে আপনার কোন সুবিধাই হবে না। এখনও যদি আপনি ধরা না দেন শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধরা পড়তে বা নিহত হতেই হবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কাজেই আমি বলি কি আপনি চলে আসুন, হয় আমার কাছে নয়তো আপনি যাকে ভাল মনে করেন এমন যে কোন বৃটিশ অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আমি জানি, আপনি কোন বৃটিশ অফিসার বা বৃটিশ প্রজাকে হত্যা করেন নি। এই ধরণের অপরাধ সম্পর্কে আপনার উপর কারু মনে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আপনি যদি মার্জনা লাভের এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চান, তা হলে এই সঙ্গে গোণ্ডার রাজা, অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দার ও সিপাইদের আত্মসমর্পণ করতে বলবেন।"

মহম্মদ হাসান থেকে খায়েরউদ্দীনের কাছে

"আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি ও সেই সঙ্গে মহারাণীর ঘোষণার একটি নকল পেয়েছি। আপনার চিঠির মধ্যে আমার নির্দোষিতার সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়েছে। এজন্য আমি বিশেষ আনন্দিত, কারণ আমি কখনও কোন বৃটিশ অফিসার বা বৃটিশ প্রজাকে হত্যা করি নি, যদিও আমি জানি ইউরোপীয় অফিসার ও তাদের সৈন্যেরা হাজার হাজার নির্দোষ ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ, এমন কি স্ত্রীলোক, অন্ধ, ফকীর ও সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের আবাসগৃহ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি লুট করে নিয়েছে। মহারাণীর ঘোষণা অনুসারে এই সমস্ত হত্যার অপরাধে যারা অপরাধী তারা নিশ্চয়ই শাস্তির যোগ্য। সিপাইদের বিদ্রোহ যখন শুরু হয়ে গেল এবং তারা যখন নির্দয়ভাবে অফিসারদের হত্যা করতে লাগল, সেই সময় যারা ইউরোপীয়দের সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে, তাদেরও অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি লুটপাট বা বিধ্বস্ত হয়েছে।

সেই দুঃসময়ের মধ্যেও যারা ইউরোপীয়দের প্রাণ রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছিল আমি তাদেরই একজন। আমি তখন ভয় ভাবনা ছেড়ে আমার

www.pathagar.com

অনুচরদের দিয়ে দুজন কর্ণেল এবং তাদের একজনের স্ত্রী ও মেয়েকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, আমার নিজের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য তাদের সাদরে রেখেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত তাদের গোরখপুরের কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমার রাজার নির্দেশে এবং খোদার মদদে আমি যখন গোরখপুর পুনরুদ্ধার করে অযোধ্যা রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম (গোরখপুর আগে অযোধ্যা রাজ্যেরই অংশ ছিল), তখনও আমার অধীনস্থ দেশীয় অফিসারদের লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত করেছি এবং কয়েকজন খৃষ্টানকে বিপদ থেকে রক্ষা করে তাদের সুস্থদেহে ও নিরাপদে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। কাজেই আমার বিবেচনায় এসম্পর্কে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসা ও অনুমোদন লাভের অধিকার আমার আছে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত শক্তিশালী, এই গভর্ণমেণ্ট বহু বিদ্রোহীর সংহার সাধন করেছেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকলে আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে ইত্যাদি বলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আমি এ সমস্ত কথার সত্যতা পুরোপুরী স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা জানবেন, সর্বশক্তিমান খোদাহ্, যাঁর অপর নাম হচ্ছে আল কাদির (শক্তিশালী) ও আল হাফিজ (রক্ষক) তিনি সব কিছুই করতে পারেন। শত্রু যদি শক্তিশালী হয়, তিনি তার চাইতেও শক্তিশালী। যদি তাঁর অভিরুচি হয় তবে তিনি প্রবলকে দুর্বল ও দুর্বলকে প্রবল করে তোলেন। তিনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে উচ্চে তোলেন, কাউকে বা রসাতলে নামিয়ে দেন। এই দুর্যোগের দিনে একথা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খোদাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ হত্যা করতে পারেনা, আগুন দিয়ে পোড়াতেও পারে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যদি খোদাহ্‌র মতই ক্ষমতা থাকত তাহলে সিপাইদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাকামনা চরিতার্থ করবার জন্য হিন্দুস্তানের প্রতিটি অধিবাসীকে হত্যা করা হত।

যে লোক তার যুদ্ধের পথকে ধর্মবিশ্বাস রূপে গ্রহণ করে সে প্রথমতঃ আপনাকে নিহত বলেই কল্পনা করে নেয়। কাজেই গ্রেফতার বা মৃত্যু সম্পর্কে এতটুকু ভয় আমার মনে নেই। আপনি ও আপনার মতই অন্যান্য সরকারী

www.pathagar.com

কর্মচারীরা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে থেকে জেহাদের মতই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করে ঐহিক জগতের সুযোগ সুবিধা ও সমৃদ্ধি লাভ করতে চান। ঠিক তেমনি আমিও বিশ্বাস করি যে, আমি যদি আমার স্বধর্ম ও রাজার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দেই, তাহলে তা আমার ইহজীবন ও পরজীবন উভয়ের পক্ষেই হিতকারী হবে।

এই ঘোষণার যে অংশে মার্জনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেখানকার ভাষা কিছুটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। এর মধ্যে এমন কোন কথা নেই যার উপরে নির্ভর করে মার্জনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন না, ঘোষণায় বলা হয়েছে, এই বিদ্রোহের সময় সাধারণভাবে যে সমস্ত লোক রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিমূলক কাজ করেছে, কতগুলি বিশেষ শর্তে তাদের ক্ষমা করা হবে। এখন ভেবে দেখুন, যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সবগুলিই রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিমূলক। তাদের সবগুলোকেই এখানে একই শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। তা ছাড়া 'সাধারণভাব' কথাটির ব্যবহার করবার ফলে এবং শর্তগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন উল্লেখ না থাকবার ফলে মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে তুলবেই।

হিন্দুস্তানের ইংরাজ শাসকেরা দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যে সমস্ত চুক্তি করেছিলেন, সেগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং চুক্তির যে সমস্ত শর্ত অলংঘনীয় হওয়া উচিত ছিল, সেগুলি লংঘন করেছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার ব্যাপারে ইংরাজেরা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। লাহোরের রাজা, পেশোয়া ও অন্যান্য বহু রাজার সঙ্গে তাদের যে সমস্ত চুক্তি হয়েছিল, সেগুলির কি দশা হয়েছে ভেবে দেখুন।

গভর্ণমেণ্টের এই জুলুমে উত্তেজিত ও মরিয়া হয়ে হিন্দুস্তানের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ সিপাইদের বিদ্রোহের সুযোগ পেয়ে এই বিদ্রোহে শামিল হয়ে গেল। ফলে খোদাহ্‌র হাজার হাজার নির্দোষ বান্দাহ্‌ নিহত ও লুণ্ঠিত হতে লাগল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে দিল। মহারাণী যদি এখনও ন্যায়সংগতভাবে কাজ করেন, অযোধ্যার রাজাকে যদি তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন, তাহলে সমস্ত অশান্তি ও হাংগামা বন্ধ হয়ে যাবে। মহারানীর ঘোষণা থেকে এ আভাসটুকু পাওয়া যায়, এ অভিপ্রায়

www.pathagar.com

যেন তাঁরও আছে। মহারাণী যদি হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের অবস্থার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে হত্যার স্রোত বন্ধ করবার জন্য অথবা ন্যায়পরায়ণতার খাতিরেই আমাদের রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন তাহলে সমস্ত হাংগামা থেমে যাবে, দেশময় শান্তি ফিরে আসবে।

কাজেই আমার অনুরোধ, আপনি আমার এই চিঠিটা গভর্ণর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি যদি ঘোষণার শর্তগুলি পূর্ণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন, অযোধ্যার উপর উপদ্রব করা থেকে বিরত থাকেন এবং সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যে সব শর্তে চুক্তি করা হয়েছিল পুনরায় সে সব শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে রাজী থাকেন, তাহলে ঘোষণার অন্যান্য দিকগুলি যাতে আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকরী করা হয় সে বিষয়ে আমি উকীল হিসাবে কাজ করব। দ্রুত উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

খায়েরউদ্দীনের মত রাজভক্ত কর্মচারীর পক্ষে এ রকম চিঠি হজম করা কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি! ইংরাজ সৈন্যেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সহস্র সহস্র নির্দোষ লোককে হত্যা করেছে, তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, একজন রাজভক্ত কর্মচারী হয়ে তিনি এমন কথা কি করে সহ্য করেন! তিনি তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করলেন। অথচ ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা, এমন কি এই সমস্ত অপরাধের অনুষ্ঠাতা যারা, তাঁরাও কিন্তু একথা অস্বীকার করেন নি। অযোধ্যা রাজ্য সম্পর্কে মহম্মদ হাসান যে দাবী করেছিলেন, সে সম্বন্ধে খায়েরউদ্দীন লিখলেন, "অযোধ্যা রাজ্য সম্পর্কে আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন এবং যার ফলাফলের উপর আপনার আত্মসমর্পণ নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন, সেই প্রস্তাবের কোন মানেই হয় না। গভর্ণমেণ্ট যা একবার দখল করে নিয়েছেন, তার একবিঘা জমিও ফিরিয়ে দেবেন না। আর এ সব নিয়ে আপনিই বা মাথা ঘামাতে আসেন কেন? নিজের সম্পর্কে যা বলবার থাকে বলুন, কিন্তু রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কথা বলবেন না। এক কথায় আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, যদি আপনি আপনার প্রাণ বাঁচাতে চান, তবে আপনাকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

তার এত বড় শাসানীতেও কোন ফল হোল না। নাজিম মহম্মদ হাসান তাঁর সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। খায়েরউদ্দীনের আমলাতান্ত্রিক ধমকের জবাবে

www.pathagar.com

কর্মচারীরা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে থেকে জেহাদের মতই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করে ঐহিক জগতের সুযোগ সুবিধা ও সমৃদ্ধি লাভ করতে চান। ঠিক তেমনি আমিও বিশ্বাস করি যে, আমি যদি আমার স্বধর্ম ও রাজার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দেই, তাহলে তা আমার ইহজীবন ও পরজীবন উভয়ের পক্ষেই হিতকারী হবে।

এই ঘোষণার যে অংশে মার্জনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেখানকার ভাষা কিছুটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। এর মধ্যে এমন কোন কথা নেই যার উপরে নির্ভর করে মার্জনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন না, ঘোষণায় বলা হয়েছে, এই বিদ্রোহের সময় সাধারণভাবে যে সমস্ত লোক রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিমূলক কাজ করেছে, কতগুলি বিশেষ শর্তে তাদের ক্ষমা করা হবে। এখন ভেবে দেখুন, যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সবগুলিই রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিমূলক। তাদের সবগুলোকেই এখানে একই শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। তা ছাড়া 'সাধারণভাব' কথাটির ব্যবহার করবার ফলে এবং শর্তগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন উল্লেখ না থাকবার ফলে মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে তুলবেই।

হিন্দুস্তানের ইংরাজ শাসকেরা দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যে সমস্ত চুক্তি করেছিলেন, সেগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং চুক্তির যে সমস্ত শর্ত অলংঘনীয় হওয়া উচিত ছিল, সেগুলি লংঘন করেছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার ব্যাপারে ইংরাজেরা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। লাহোরের রাজা, পেশোয়া ও অন্যান্য বহু রাজার সঙ্গে তাদের যে সমস্ত চুক্তি হয়েছিল, সেগুলির কি দশা হয়েছে ভেবে দেখুন।

গভর্ণমেণ্টের এই জুলুমে উত্তেজিত ও মরিয়া হয়ে হিন্দুস্তানের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ সিপাইদের বিদ্রোহের সুযোগ পেয়ে এই বিদ্রোহে শামিল হয়ে গেল। ফলে খোদাহ্‌র হাজার হাজার নির্দোষ বান্দাহ্‌ নিহত ও লুণ্ঠিত হতে লাগল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে দিল। মহারাণী যদি এখনও ন্যায়সংগতভাবে কাজ করেন, অযোধ্যার রাজাকে যদি তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন, তাহলে সমস্ত অশান্তি ও হাংগামা বন্ধ হয়ে যাবে। মহারানীর ঘোষণা থেকে এ আভাসটুকু পাওয়া যায়, এ অভিপ্রায়

www.pathagar.com

যেন তাঁরও আছে। মহারাণী যদি হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের অবস্থার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে হত্যার স্রোত বন্ধ করবার জন্য অথবা ন্যায়পরায়ণতার খাতিরেই আমাদের রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন তাহলে সমস্ত হাংগামা থেমে যাবে, দেশময় শান্তি ফিরে আসবে।

কাজেই আমার অনুরোধ, আপনি আমার এই চিঠিটা গভর্ণর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি যদি ঘোষণার শর্তগুলি পূর্ণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন, অযোধ্যার উপর উপদ্রব করা থেকে বিরত থাকেন এবং সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যে সব শর্তে চুক্তি করা হয়েছিল পুনরায় সে সব শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে রাজী থাকেন, তাহলে ঘোষণার অন্যান্য দিকগুলি যাতে আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকরী করা হয় সে বিষয়ে আমি উকীল হিসাবে কাজ করব। দ্রুত উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

খায়েরউদ্দীনের মত রাজভক্ত কর্মচারীর পক্ষে এ রকম চিঠি হজম করা কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি! ইংরাজ সৈন্যেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সহস্র সহস্র নির্দোষ লোককে হত্যা করেছে, তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, একজন রাজভক্ত কর্মচারী হয়ে তিনি এমন কথা কি করে সহ্য করেন! তিনি তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করলেন। অথচ ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা, এমন কি এই সমস্ত অপরাধের অনুষ্ঠাতা যারা, তাঁরাও কিন্তু একথা অস্বীকার করেন নি। অযোধ্যা রাজ্য সম্পর্কে মহম্মদ হাসান যে দাবী করেছিলেন, সে সম্বন্ধে খায়েরউদ্দীন লিখলেন, "অযোধ্যা রাজ্য সম্পর্কে আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন এবং যার ফলাফলের উপর আপনার আত্মসমর্পণ নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন, সেই প্রস্তাবের কোন মানেই হয় না। গভর্ণমেণ্ট যা একবার দখল করে নিয়েছেন, তার একবিঘা জমিও ফিরিয়ে দেবেন না। আর এ সব নিয়ে আপনিই বা মাথা ঘামাতে আসেন কেন? নিজের সম্পর্কে যা বলবার থাকে বলুন, কিন্তু রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কথা বলবেন না। এক কথায় আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, যদি আপনি আপনার প্রাণ বাঁচাতে চান, তবে আপনাকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

তার এত বড় শাসানীতেও কোন ফল হোল না। নাজিম মহম্মদ হাসান তাঁর সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। খায়েরউদ্দীনের আমলাতান্ত্রিক ধমকের জবাবে

www.pathagar.com

শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় লিখলেন যে তিনি তাঁর জীবনের জন্য বিদ্রোহী-দের শক্তির উপর তিলমাত্রও নির্ভর করেন না।

"সর্বশক্তিমান খোদাহ্‌র উপর আমার একান্ত নির্ভর। তিনি যদি আমাকে রক্ষা করেন, কোন দুশমনের শক্তি নাই যে আমার ক্ষতি করে। আর তিনি যদি মুখ ফেরান, কোন শক্তিই আমার কোন কাজে আসবে না।

"যে গভর্ণমেণ্ট মানুষের উপর সকল রকমের অত্যাচার চালিয়ে আসছে, কর্ণেল লেক (লেনক্স) ও দুইটি মহিলার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম বলে সেই গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন কিছু আশা করতে যাওয়া আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

"যদি আমি আমার জীবন ও পার্থিব সম্পদকে আমার ধর্মের চেয়েও বড় করে দেখতাম, তা'হলে আমি অবশ্যই আপনার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতাম।

"আমি বালারাও বা নানার ভৃত্য নই, আমি তাঁদের কানপুরের শিবিরে যাইওনি কখনো। কাজেই ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের উপরে যে জঘন্য অপরাধের কাজ করা হয়েছিল, তার দায়িত্ব আমার উপরে কখনোই এসে পড়ে না।

"আমার বিবেচনায় এ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করা আমার পক্ষে শুধু যে বৈধ হবেনা তা নয়, একটা মারাত্মক অপরাধের কাজও হবে। এ ছাড়া আর যে সমস্ত কথা আপনি লিখেছেন, তার উত্তর দিতে গেলে বৃথা তিক্ত আলোচনার সৃষ্টি হবে মাত্র। কাজেই এই পর্যন্তই যথেষ্ট।"

পরে মহম্মদ হাসান তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু গোরখপুরের কমিশনার মিঃ উইংফিণ্ড তাঁর উপর বেজায় খাপ্পা ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর ইংগিতেই খায়েরুদ্দীন আহমদ মহম্মদ হাসানের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তার উত্তরে মহম্মদ হাসান যে কড়া জবাব দিয়েছিলেন, তার তাতটা মিঃ উইংফিণ্ডের গায়ে ভাল মতই লেগেছিল। তাইতেই তিনি এতটা চটে গিয়েছিলেন। মহম্মদ হাসান সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে আত্মসমর্পণ করবার

www.pathagar.com

পর মিঃ উইংফিণ্ড স্যার হোর গ্রাণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে, তিনি নাকি এই বিদ্রোহী নেতাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তা ছাড়া মিঃ পেপী নামক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের হত্যার জন্য তিনি মহম্মদ হাসানকে দায়ী করলেন। মহম্মদ হাসানের ভাগ্যের জোরে মিঃ পেপীকে জীবিত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছিল।

গভর্ণমেণ্ট মহম্মদ হাসানকে সীতাপুর জেলায় বাস করবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

যবনিকা পতন

১৮৫৮ সালের শেষভাগ। বিদ্রোহ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। এই ভাঙ্গনকে রোধ করবার শক্তি কারো নেই। বিদ্রোহের নেতারা আক্রমণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এখন মাথা বাঁচাবার আশ্রয় খুঁজে ফিরছেন। ঘাঁটির পর ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে চলছেন উত্তরে, আরও উত্তরে।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল পিছন পিছন তাড়া করে চলেছেন, কোথাও তাঁদের স্থির হয়ে বসবার সুযোগ দিচ্ছেন না। স্যার কলিন অযোধ্যার রাজপুত প্রধানদের ঘাঁটিগুলিকে একটির পর একটি হস্তগত করে চললেন। প্রথমে রামপুর কাসিয়া, তারপর আমেথি। কোন জায়গাতেই বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, সহজেই তারা আত্মসমর্পণ করল।

স্যার কলিনের এবার দৃষ্টি পড়ল শঙ্করপুরের দিকে। এখানে বৈসওয়ার রাজপুতদের বীর নেতা বেণী মাধো অনেকদিন ধরেই তাঁদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিদ্রোহ ভাঙ্গনের মুখে, কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেণী মাধো কোনদিন ভেঙ্গে পড়েন নি।

স্যার কলিন প্রথমতঃ আপোষের মধ্য দিয়ে তাঁর এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে বশে আনবার চেষ্টা করে দেখলেন। তিনি বেণী মাধোর কাছে খবর দিয়ে পাঠালেন যে তিনি যদি এখনও বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে তাঁকে কোন শাস্তি দেওয়া তো হবেই না, বরঞ্চ যে সম্পত্তি তিনি এখনও ভোগ করছেন, এই সম্পত্তির মালিকানা তাঁরই হাতে থাকবে। বেণী মাধো অন্য ধাতুর লোক, তাঁকে ভেঙ্গে ফেলা যায়, কিন্তু নোয়ানো যায় না। এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি জানালেন, "আমার শরীর আমার নিজের সম্পত্তি নয়—এর মালিক অযোধ্যার রাজা। কাজেই এ শরীর আর কাউকে সমর্পণ করবার অধিকারী আমি নই। তবে এই কেল্লাটা আমার নিজের সম্পত্তি, এটা আমি আপনার হাতে সমর্পণ করতে পারি।"

বেণী মাধো বুঝতে পেরেছিলেন এই কেল্লায় বসে স্যার কলিনের

www.pathagar.com

আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা কোন মতেই সম্ভব হবে না। কাজেই তিনি গোপনে রাত্রির অন্ধকারে কেল্লা ত্যাগ করলেন। ব্রিগেডিয়ার এভেলেঘকে তাঁর পিছনে ধাওয়া করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোল। কিন্তু কার পিছনে তিনি ধাওয়া করবেন? কোথায় বেণী মাধো? সাংবাদিক রাসেল সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখছেন, "বেণী মাধোকে খুঁজে বের করতে হবে, আপাততঃ এইটাই সমস্যা। আমাদের গুপ্তচর বিভাগ থেকে আমরা 'সুনিশ্চিত' সংবাদ পাচ্ছি যে, বেণী মাধো একই দিনের একই সময়ে নানা দিকে নানা জায়গায় অবস্থান করছেন। এই রিপোর্টগুলি যাচাই করে দেখতে হলে একত্রিশটি বাহিনীকে একত্রিশ দিকে পাঠাতে হয়।"

অবশেষে তাঁর সঠিক ঠিকানা পাওয়া গেল। ২৪শে নভেম্বর দু'পক্ষের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হোল, কিন্তু বেণী মাধোকে ধরতে পারা গেল না। সেই যে তিনি তাঁর জন্মভূমি বৈসওয়ারা ত্যাগ করলেন, আর কোনদিন সেখানে ফিরে আসতে পারেননি। ৪ঠা ডিসেম্বর একটা সংবাদ পাওয়া গেল যে বেণী মাধো নাকি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। কেবলমাত্র ৫০০০ সৈন্য দলে দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এর পর বেণী মাধো অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হবার জন্য উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

স্যার কলিনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবার সফল হতে চলল। এই পরিকল্পনা অনুসারে বেণী মাধো, দেবীবকস, মহম্মদ হাসান, মেহদী হাসান, অমর সিং, খান বাহাদুর খাঁ, বেগম হযরত মহল, মাম্মু খাঁ, নানা সাহেব, বালা সাহেব, জওয়ালা প্রসাদ প্রমুখ বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট নেতাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত করে একই বেড়াজালের মধ্যে ফেলে নেপালের সীমান্তে একটি সংকীর্ণ জায়গায় নিয়ে এসে ঘেরাও করে ফেলা হোল। এখন জঙ্গ বাহাদুরের এলাকায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই বাকী কাজটা শেষ হয়ে যায়।

বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে একজন কিন্তু এই ফাঁদে আটকা পড়তে রাজী হলেন না। তিনি হচ্ছেন শাহজাদা ফিরোজ শাহ্। দু' হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছিয়ে এলেন। তারপর গঙ্গা

www.pathagar.com

পাড়ি দিয়ে এটোয়ায় গিয়ে উঠলেন। ব্রিগেডিয়ার ট্রপ ও ব্রিগেডিয়ার মার্কার অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আটকাতে পারলেন না। এর পরেই ফিরোজ শাহ্, রাও সাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

এই সময় কমিশনার মেজর ব্যারো মহারাণীর ঘোষণা অনুযায়ী আত্ম-সমর্পণের জন্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে মধ্যস্থ মারফৎ কিছু কিছু আলাপ আলোচনা চালান। এমন কি স্বয়ং বেগম হযরত মহল ও ব্রিজিস কাদের মেজর ব্যারোর কাছে এ সম্পর্কে চিঠি ও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আলোচনায় কোনই ফল হোল না। বৃটিশের আন্তরিকতা সম্পর্কে বেগমের মনে এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। আর বেগম যতক্ষণ রাজী না হবেন ততক্ষণ রাজভক্ত বেণী মাধোর রাজী হবার প্রশ্নই ওঠে না। মাম্মু খাঁ স্বতন্ত্র কোন সিদ্ধান্ত নিলেন না। নানাসাহেব জানালেন যে তিনি তাঁর জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা না পেলে ধরা দেবেন না।

আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর স্যার কলিন আবার বিদ্রোহীদের পিছন ছুটলেন। বারোরদিয়াতে বেণী মাধোর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বেণী মাধো কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। স্যার কলিন নানপারায় এসে জানতে পারলেন যে নানা ও বেণী মাধো সেখান থেকে ২০ মাইল দূরে বাঁকিতে আছেন। বাঁকি রাপ্তি নদীর ধারে। তিনি স্থির করলেন সারারাত্রি মার্চ করে অতর্কিতে তাঁদের উপর গিয়ে পড়বেন। কিন্তু খবরটা বিদ্রোহীদের কানে পৌঁছে গিয়েছিল। নানা নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলেন। বিদ্রোহী বাহিনী তাঁর অনুসরণ না করে স্যার কলিনকে প্রতিরোধ করে দাঁড়াল। স্যার কলিন বিদ্রোহীদের নেপালের এলাকায় ঠেলে দিয়ে ১৮ই জানুয়ারী তারিখে লক্ষ্ণৌ শহরে ফিরে এলেন।

বাঁকির যুদ্ধের পর কয়েকজন বিশিষ্ট বিদ্রোহী নেতা আত্মসমর্পণ করলেন। সাংবাদিক রাসেল সাহেব লিখছেন ঃ

"৭ই তারিখে সকাল বেলা আমরা রওনা হবার আগেই ফরাক্কাবাদের নবাব তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে রাপ্তি নদী পার হয়ে এসে মেজর ব্যারোর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। মেহদি হোসেন এবং আরও কয়েকজন বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা এই সময় ধরা দিলেন। এই লোকগুলি মাত্র

www.pathagar.com

কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের সঙ্গে লড়াই করছিল, আর এখন কেমন দিব্যি সহজ স্বাভাবিক ভাবে অতি স্বচ্ছন্দচিত্তে স্পেশাল কমিশনের তাঁবুতে বসে আছে, যেন কিছুই হয়নি। চিত্তাকর্ষক দৃশ্যই বটে!"

প্রধান প্রধান বিদ্রোহী নেতারা এবার নেপালের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর প্রথম থেকেই প্রকাশ্যে বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়ে এসেছেন, তবু তাঁর সম্পর্কে নেতাদের মনে কেন যে মোহ ছিল বোঝা খুবই কঠিন! তাঁদের মনে মনে বিশ্বাস ছিল বিপদের দিনে তাঁর কাছে আশ্রয় মিলবেই। তাই দেখতে পাই, অনেকদিন আগে থেকেই ব্রিজিস কাদির, তাঁর প্রতিনিধিগণ ও নানা সাহেব তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করে আসছিলেন। ১৮৫৮ সালের ১৯শে মে ব্রিজিস্ কাদির তাঁর কাছে লিখছেন ঃ

"কিছুদিন আগে বৃটিশ সরকার আমাদের গরু ও শুয়োরের চর্বি মাখানো টোটা দাঁতে কাটতে আদেশ দিয়ে আমাদের হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করতে চেয়েছিল। সিপাইরা এ কাজ করতে অস্বীকার করবার অপরাধে তাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হোল। এই হচ্ছে যুদ্ধ বাধবার কারণ।"

কিন্তু এসব ধর্মীয় যুক্তিতে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জঙ্গ বাহাদুরকে টলানো গেল না। তিনি সকল ধর্মের সেরা ধর্ম চিনেছিলেন, তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বৃটিশের সেবা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ১৫ই জানুয়ারী তিনি বেগমকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন, "এটা জেনে রাখবেন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ও নেপাল রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সম্পর্ক রয়েছে এবং এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তি বলবৎ আছে যে, এক রাষ্ট্রের শত্রু অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে তাকে ধরে পূর্বোক্ত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই আমি আপনাদের লিখে জানাচ্ছি, যদি আপনারা আমার রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন তবে পূর্বোক্ত চুক্তি মোতাবেক গুর্খা সৈন্যেরা নিশ্চয়ই আপনাদের উপর আক্রমণ করবে। আরও জেনে রাখুন, যারা নিমকহারামী করে অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্নের মত প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, নেপাল রাষ্ট্র তাদের কোনরূপ সাহায্য বা আশ্রয় দেবেনা।

www.pathagar.com

কিন্তু নেপাল গভর্ণমেণ্ট এঁদের নিয়ে উভয়সংকটে পড়ে গিয়েছিল। ইংরাজের মনস্তুষ্টি সাধন করে তাকে চলতেই হবে, কাজেই তার শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া কোনমতেই চলেনা, অন্যদিকে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রার্থীদের ধরিয়ে দেওয়াটা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পক্ষে হানিকর। এ অবস্থায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বিদায় করতে পারলেই ভাল। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে অগত্যা বল প্রয়োগ করতেই হবে।

বিদ্রোহীরা সংখ্যায় কত ছিল সঠিক বলা যায় না। চার হাজার থেকে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত শোনা গেছে। এই হতভাগ্য পলাতকের দল চিতওয়ান, ভুটওয়াল এবং নয়াকোটের মধ্যে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে ঘুরে মরছিল। অসহ্য দুর্দশা ও অভাবের মধ্য দিয়ে তাদের দিন কাটছিল। কোন কোন সিপাই খাদ্যের জন্য তাদের বন্দুক বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়েছে। গুর্খারা তাদের কাছে চাল বিক্রী করতে আপত্তি করত না, কিন্তু ভীষণ চড়া দাম আদায় করত। জ্বর ও আমাশয় রোগে ভুগে বহু লোক মারা পড়তে লাগল, তেমনি মরতে লাগল অনাহারে।

নেপাল গভর্ণমেণ্ট এবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর সৈন্যেরা এই অবাঞ্ছিত মেহমানদের ধরে ধরে নেপাল থেকে বহিষ্কার করতে লাগল। শঙ্করপুরের বীর নেতা বেণী মাধো গুর্খা সৈন্যদের হাতে ধরা দিতে রাজী হলেন না। দঙ্গ উপত্যকায় গুর্খা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি প্রাণ দিলেন। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই এই যুদ্ধে মারা যায়। বেণী মাধোর ভাই যোগরাজ সিংও এই যুদ্ধে নিহত হন। বেণী মাধোর বিধবা স্ত্রী ও ছেলে ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নেপালেই ছিলেন। বেণী মাধোর মৃত্যুর সময় ছেলেটির বয়স ছিল তেরো কি চৌদ্দ। পরে তাকে সীতাপুরে নিয়ে আসা হোল। নবাব মাম্মু খাঁ, খান বাহাদুর খান, জওয়ালাপ্রসাদ এবং আরও বহু বিদ্রোহীকে নেপাল গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করেন। গোণ্ডার রাজা দেবী বকস, খয়রাবাদের চাকলাদার হরপ্রসাদ, বিস্‌ওয়ার গোলাব সিং নেপালেই মারা যান। কি ভাবে মারা যান, জানা যায় নি। বুঁদীর হরদৎ সিংকে হত্যা করা হয়েছিল। আজিমুল্লাহ্‌ খাঁ অক্টোবর মাসে ভুটওয়ালে মারা যান। ম্যালে-

www.pathagar.com

রিয়াতে বালা সাহেবের মৃত্যু হয়। নানা সাহেবের মৃত্যুসংবাদ না পাওয়া গেলেও, মনে হয় তিনিও এই রোগেই মারা গিয়েছিলেন।

বেগম হযরত মহল তাঁর ছেলেকে নিয়ে গুর্খাদের দেশেই থেকে গেলেন। তাঁর স্বামীকে যে পেনসন দেওয়া হোত, তা ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে তাঁকে একটা পেনসন দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে সসম্মানে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফিরে আসতে কিছুতেই রাজী হলেন না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে পেনসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা' তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

খান বাহাদুর খান ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের হত্যার অভিযোগ ছিল। ১৮৬০ সালের ৩রা মে তারিখে সতী চওড়ার ঘাটে জওয়ালা প্রসাদকে ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। বখত খাঁ দিল্লী ছেড়ে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত এসেছিলেন। তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। শুধু এইটুকুই জানা গেছে যে তিনি ১৮৫৯ সালের ১৩ই মে যুদ্ধে মারা যান।

বাকী রইলেন তাঁতীয়া টোপী, রাও সাহেব আর ফিরোজ শাহ। তাঁতীয়ার ফাঁসির কথা আগেই বলা হয়েছে।

রাও সাহেব যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি সিরোন্‌জ থেকে উজ্জয়িনী, উজ্জয়িনী থেকে উদয়পুরে এলেন। এখানে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তাঁকে নিয়ে তিনি দিল্লী গেলেন। সেখান থেকে থানেশ্বরী, জ্বালামুখী ও কাংড়া হয়ে জম্মুর অন্তর্গত চেনানিতে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। এখানে একজন মারাঠি তাঁকে ধরিয়ে দেয়। পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব ওরফে রাও সাহেবকে ফাঁসিতে ঝুলানো হোল।

দিল্লীর শাহজাদাদের মধ্যে ফিরোজ শাহ্‌ই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুঃখকর পরিণাম তাঁকে সমস্ত জীবন ভরে বহন করে চলতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন ইউরোপীয়ের হত্যার অভিযোগ ছিল না। মহারাণীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ তাঁর ছিল। ১৮৫৯ সালের জুন মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর এ সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু স্বাধীন-চেতা ফিরোজ শাহ্‌ গভর্ণমেণ্টের শর্ত মেনে নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে রাজী হলেন

www.pathagar.com

না। আত্মসমর্পণ করবার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কাছে তিনি তিনটি শর্ত উপস্থিত করেছিলেন ঃ ১। তাঁকে উপযুক্ত ভাতা দিতে হবে। ২। তাঁর অবাধ চলাচলের অধিকার দিতে হবে, স্থান বিশেষে আটক রাখা চলবে না। ৩। তাঁর দশ বারো জন অনুচর ছিল, গভর্ণমেণ্ট তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে পারবেন না। গভর্ণমেণ্ট তাঁর এই শর্ত মেনে নিতে রাজী হলেন না। বাবরের বংশধর ফিরোজ শাহ্ নিরাপত্তা ও মর্যাদার মধ্যে মর্যাদাকেই বেছে নিলেন।

এর পর ফিরোজ শাহ্ আর ভারতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। তিনি গোপনে ভারত ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স আর কতই বা, ত্রিশের মত হবে। ভারতের সঙ্গে এইখানেই তাঁর সম্পর্কের শেষ। আর কোনদিন তিনি দেশে ফিরবার সুযোগ পান নি। ১৮৬০ সালে তিনি কান্দাহারে ছিলেন এই খবর পাওয়া গেল। এর পর থেকে তিনি যেখানেই গেছেন বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ১৮৬১ সালে তাঁকে বোখারায় দেখা যায়। এখানে তাঁকে অত্যন্ত আর্থিক কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছিল। ১৮৬২ সালে তিনি তেহারাণে ফিরে এলেন। এর পর কয়েকটা বছর তিনি হেরাত ও বোখারার মধ্যেই চলাচল করছিলেন। ১৮৬৮ সালে তিনি ভারতের সীমান্ত-ঘেষা সোয়াত উপত্যকায় চলে আসেন। সোয়াত থেকে তিনি কাবুল গেলেন। কিন্তু আফগানিস্তানের আমীর তাঁকে মেহমান হিসাবে পেয়ে বিশেষ খুশী হলেন না।

ফিরোজ শাহ্‌র রাজধানী কাবুলে থাকলে তাঁর বৃটিশ বন্ধুদের মনে সন্দেহ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে, এ ভয় তাঁর মনে মনে ছিল। তাই তিনি তাঁকে বাদাকশানে চলে যেতে বললেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ্ বেশী দিন সেখানে ছিলেন না। এর পরেই তাঁকে দেখতে পাই সমরখন্দে। কি উদ্দেশ্যে তিনি একটির পর একটি মুসলিম রাষ্ট্রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সে খবর কিছুই জানা যায় নি। ১৮৭২ এর অক্টোবরে তাঁকে কনষ্ট্যান্টিনোপলে দেখা গিয়েছে। অভাব, উদ্বেগ ও দুঃসহ কষ্টভোগের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তিনি অসময়ে বার্ধক্যে আক্রান্ত হন!

www.pathagar.com

১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে ক্যাপটেন হাণ্টার তাঁর সম্পর্কে লিখ

"ইস্তাম্বুলে অনেকের কাছে শোনা গেছে যে ফিরোজ শাহ্ মাস আগে মীর্জা মহম্মদের সঙ্গে মক্কার পথে যাত্রা করেছেন। সংবাদদাতা বলেছেন যে তিনি এখানে তাঁকে সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর শরীর তখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে, একটা চোখ প্রায় অন্ধ, পা'টা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।" সে সময় তাঁর বয়স ৪ এর বেশী নয়। ১৮৭৫ সালের জুন মাসে তিনি মক্কায় যান এবং ১৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সেখানেই তাঁর চিরবিশ্রামলাভ ঘটে। এই অশা বিদ্রোহীর উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণযাত্রা এতদিনে সমাপ্তির ঘাটে এসে পৌঁছল।

এই ভাবে স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ফিরোজ শাহ্ স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে, বিদেশে বিদেশীদের মধ্যে তাঁর শেষ নিঃশ্বা ত্যাগ করলেন। দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তাঁ দেশবাসী কি সেকথা মনে রেখেছে? দেশভক্ত ফিরোজ শাহ কেবলমা নিজের চেষ্টার জোরে তাঁর সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুলেছিলেন এবং দু বছর পর্যন্ত সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সংগ্রাম করে চলেছিলেন নির্দোষীর রক্তপাতে তাঁর হাত কোনদিন কলুষিত হয় নি। শিশু হত ও নারী হত্যার বিরুদ্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিন্দা জানিয়েছেন। তা তাঁর ১৮৫৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় বলেছেন, "এই নির্দে শিশু ও নারীদের হত্যা করতে গিয়ে আমাদের লোকেরা ইংরাজে পরাজিত করবার কাজটাকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে। নেতারা কখনো এমন নির্দেশ দেয়নি। এই ধরণের কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমাদের প জেহাদ ঘোষণা করতে হবে।"

এই ভাবে বিদ্রোহের বাতিগুলি একটি একটি করে নিবে গেল। রঙ্গম গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেল। যবনিকা পতন হোল।

কিন্তু কিছুই একেবারে নিঃশেষ হয় না। রাত্রির গভীর অন্ধকারে ওপারেই আছে আলোকোজ্জ্বল প্রভাত। রাত্রি তারই জন্য তপস্যা করে চলেছে। যবনিকা আবার উঠবে। আবার নতুন প্রভাত, নতুন দৃ দেখা দেবে।

সমাপ্ত